হাজ্জ ও উমরাহ-১ম পর্ব

আসসালামু’আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি
ওয়া বারাকাতুহ

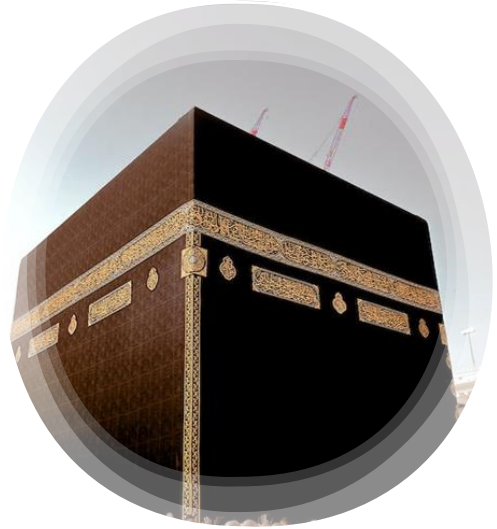

হজ্জ পালনের জন্য যারা সফরের ইচ্ছা পোষন করেন, তাদের জন্য হজ্জের ইতিহাস, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা ও সঠিকভাবে হজ্জের করনীয় এবং কাজের নির্দেশনা জানা থাকা খুবই জরুরী। জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ও উমরাহ পালন করা ফরয। ফরয কাজ যা সুন্দর ও সঠিক নিয়মে করা অত্যাবশ্যক। তবে নফল হজ্জ ও উমরাহ একাধিকবার করাও সুন্নাত। তাই কুর'আন ও হাদীস থেকে সহিহ জ্ঞান নিয়ে মূল্যবান এই ইবাদাত আদায় করা প্রয়োজন।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ৩:৯৬

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে।সূরা আলে ইমরান: ৯৬

আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ করো। সূরা আল বাকারা:১৯৬

তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাবার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ (তা) প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। সূরা আলে ইমরান: ৯৭

লোকেরা আপনাকে (হে মুহাম্মাদ সা.) চাঁদ ছোট বড়ো হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দিন: এটা হচ্ছে মানুষের জন্য তারিখ নির্ণয় ও হজ্জের আলামত।
সূরা আল বাকারা:১৮৯

আবু হুরায়রা রা: এর হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করেন; কিন্তু কোন পাপের কথা বা কাজ করেননি সে ব্যক্তি ঐদিনের মত হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল"। সহিহ বুখারী:১৫২১ ও সহিহ মুসলিম ১৩৫০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: "এক উমরা আরেক উমরা মাঝের গুনাহ মোচনকারী। আর মাবরুর হজ্বের প্রতিদান হচ্ছে- জান্নাত"। সহিহ বুখারি: ১৭৭৩ ও সহিহ মুসলিম: ১৩৪৯

কুর’আন ও হাদীসের আলোকে হজ্জ

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা(রা) থেকে বর্নিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল স. জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহন করবোনা? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্মম জিহাদ হচ্ছে, “হজ্জে মাবরুর”। বুখারী শরীফ: ১৪২১

আবু হুরায়রা রা: এর হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করেন; কিন্তু কোন পাপের কথা বা কাজ করেননি সে ব্যক্তি ঐদিনের মত হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল”। সহিহ বুখারী:১৫২১ ও সহিহ মুসলিম ১৩৫০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “এক উমরা আরেক উমরা মাঝের গুনাহ মোচনকারী। আর মাবরুর হজ্বের প্রতিদান হচ্ছে- জান্নাত”। সহিহ বুখারি: ১৭৭৩ ও সহিহ মুসলিম: ১৩৪৯

আবু হুরায়রা রা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “যদি বান্দাহ কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে অন্য জুমা, এক রমাদান থেকে অন্য রমাদান মধ্যবর্তী গুনাহগুলোকে মার্জনা করিয়ে দেয়।” সহিহ মুসলিম: ১/২০৯

আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে। সহীহ জামে আত তিরমিযী

বিদায় হজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে জনগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম-কানুন শিখে নাও”। সহীহ মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি হজের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত সেটা সম্পাদন করে”। আবু দাউদ; মিশকাতঃ ২৫২৩

ইতিহাসের পাতায় হাজ্জ

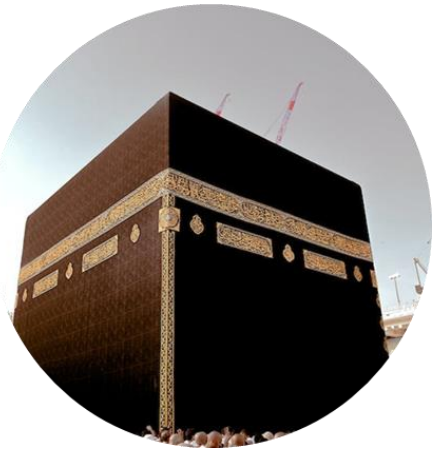

হজ্জ একটি আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। আরবী ভাষায় ‘হজ্জ’ অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কা’বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারদিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে ‘হজ্জ’।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়,হজ্জ হলো পবিত্র কা’বা শরীফ এবং মক্কা শরীফের সন্নিকটে মীনা, মুযদালিফা ও আরাফার ময়দানে যিলহজ্জ মাসের ৮ থেকে ১২/১৩ তারিখের মধ্যে শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসারে কতগুলো আমল (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করাকে হজ্জ বলে।

ইবরাহীম আ. জাতির উপাস্য মূর্তিগুলোকে পূজা না করে বরং পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছেই তিনি উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করলেনঃ يٰقَوْمِ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সূরা আল আন’আম:৭৮

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ

আমি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্ত্বাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। সূরা আল আন’আম: ৭৯

ইতিহাসের পাতায় হাজ্জ

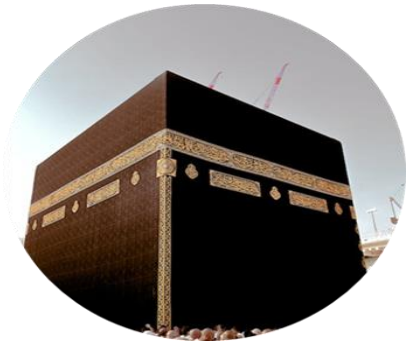

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "এবং যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সেই পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলো তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম (অগ্রবর্তী নেতা) নিযুক্ত করেছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের প্রতিও কি এ হুকুম ? আল্লাহ তায়ালা বললেন: যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।" সূরা আল বাকারা: ১২৪

জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে হিজাযের মক্কা নগরীতে বসালেন এবং দীর্ঘকাল যাবত নিজেই তাঁর সাথে থেকে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। তারপর এখানেই পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে ইসলাম প্রচার প্রসারের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায়ে কা'বা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছিলেন, নিজেই এটা গড়ে তোলার স্থান ঠিক করেছিলেন। খানায়ে কা'বা সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক ইবাদাতের স্থান নয়, প্রথম দিন থেকেই এটা দীন ইসলামের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আবার এখান থেকেই ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হলো 'হজ্জ'।

এ ইবাদাত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কি করে হলো, কোন সব পূত ভাবধারা এবং দোআ প্রার্থনা সহকারে পিতা-পুত্র মিলে এ ইমারত তৈরী করেছিলেন আর 'হজ্জ' কিভাবে শুরু হলো তার বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ পবিত্র আল কুরআনে এভাবে জানিয়েছেন:

মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা মক্কার ঘর তাতে সন্দেহ নেই। এটা অত্যন্ত পবিত্র, বরকতপূর্ণ এবং সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। এতে আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বর্তমান রয়েছে, 'মাকামে ইবরাহীম' রয়েছে এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে সেই নিরাপদে থাকবে।

সূরা আলে ইমরান: ৯৬-৯৭

আমরা মানুষের জন্য কিরূপে বিপদশূন্য ও শান্তিপূর্ণ হেরেম তৈরী করেছি তা কি তারা দেখতে পায়নি ? অথচ তার চারপাশে লোক লুন্ঠিত ও ছিনতাই হয়ে যেতো। সূরা আল আনকাবুত: ৬৭

ইতিহাসের পাতায় হাজ্জ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

এবং স্মরণ কর, যখন আমরা এ ঘরকে লোকদের কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয় স্থল বানিয়েছিলাম এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থানকে 'মুসাল্লা' (জায়নামায) বানাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম আর তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী এবং নামাযীদের জন্য আমার ঘরকে পাক ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরে যখন ইবরাহীম দোয়া করলো, হে পালনকর্তা আপনি এ শহরকে শান্তিপূর্ণ জনপদে পরিণত করুন এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদের জন্য ফল-মূল দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে দিন। সূরা আল বাকারা: ১২৫-১২৬

এবং স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে দোয়া করছিল: হে আল্লাহ! আমাদের এ চেষ্টা কুবল কর, তুমি সবকিছু জান ও শুনতে পাও। পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদের দু'জনকেই মুসলিম- অর্থাৎ তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশাবলী থেকে এমন একটি জাতি তৈরী কর যারা একান্তভাবে, তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদাত করার পন্থা বলে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! তুমি সে জাতির প্রতি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার বাণী পড়ে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দেবে এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করবে। নিশ্চয় তুমি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিজ্ঞ। সূরা আল বাকারা: ১২৭-১২৯

এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিল:

হে আল্লাহ ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তিপূজার শির্ক থেকে বাচাও।

হে আল্লাহ ! এ মূর্তিগুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব, যে আমার পন্থা অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পন্থার বিপরীত চলবে,তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

পরাওয়ারদিগার ! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এ মহান ঘরের নিকট, এ ধূসর মরূভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নামাযের ব্যবস্থা কায়েম করবে। অতএব, হে আল্লাহ ! তুমি লোকদের মনে এতদূর উৎসাহ দাও যেন তারা এদের জীবিকার ব্যবস্থা করে। হয়ত এরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে।সূরা ইবরাহীম: ৩৫-৩৭

এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম একথা বলে যে, এখানে কোনো প্রকার শিরক করো না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পাক-সাফ করে রাখ। আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানাও- তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন দুনিয়ার কল্যানের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও খেতে দেবে। সূরা আল হজ্জ: ২৬-২৮

বর্তমানের হজ্জ প্রবর্তন যেভাবেঃ

হযরত ইবারাহীম আলাইহিস সালাম যেমন বাতিল মতবাদ ও সমগ্র মিথ্যা প্রভূত্ব ধ্বংস করা এবং এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছিলেন, শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই করেছিলেন। তিনি হযরত ইবারাহীম আলাইহিস সালামের প্রচারিত প্রকৃত ও নির্মল দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একুশ বছরের চেষ্টায় তার এসব কাজ যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তায়ালার হুকুমে কা'বা ঘরকেই তিনি সমগ্র দুনিয়ায় এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের কেন্দ্ররূপে স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন এবং দুনিয়ার সকল দিক থেকেই হজ্জ করার জন্য কা'বা ঘরে এসে জমায়েত হওয়ার আহবান জানালেনঃ

মানুষের ওপর আল্লাহর হক এই যে, এ কা'বা ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ যাদের আছে তারা হজ্জ করার জন্য এখানে আসবে। যারা কুফুরী করবে (অর্থাৎ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করতে আসবে না), তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।সূরা আলে ইমরান: ৯৭

এভাবে নব পর্যায়ে হজ্জ প্রবর্তন করার সাথে সাথে জাহেলী যুগে দু'হাজার বছর যাবত প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার একেবারে বন্ধ করা হলো।

আল্লাহর আদেশ হলো:

(আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদাত করার,) যে পন্থা আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তদনুযায়ী আল্লাহর স্মরণ (ও ইবাদাত) কর যদিও এর পূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে (অর্থাৎ স্মরণ ও ইবাদাত করার সঠিক পন্থা জানতে না) সূরা আল বাকারা:১৯৮

সম্বল না নিয়ে হজ্জযাত্রা করা নিষিদ্ধ হলো এবং পরিস্কার বলে দেয়া হলো:

হজ্জ গমনকালে সম্বল অবশ্যই নেবে। কারণ, (দুনিয়ার সফরের সম্বল না নেয়া আখেরাতের সম্বল নয়) আখেরাতের উত্তম সম্বল তো হচ্ছে তাকওয়া।

সুরা আল বাকারা: ১৯৭

(হজ্জে গমনকালে) ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ কিছু কামাই রোযগার করলে তাতে কোন অপরাধ নেই।সুরা আল বাকারা: ১৯৮

জাহেলী যুগের অসংখ্য কুসংস্কার নির্মূল করে দিয়ে তাকওয়া, আল্লাহর ভয়, পবিত্রতা এবং অনাড়ম্বরতাকে মানবতার পূর্ণাংগ আদেশ বলে ঘোষনা করা হলো, হজ্জযাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তারা যেন ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদেরকে সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে নেয়, নফসের খাহেশ ও লালসা যেন ত্যাগ করে, হজ্জ গমন পথে স্ত্রী-সহবাসও যেন না করে, গালাগাল, কুৎসা রটানো, অশ্লীল উক্তি প্রভৃতি জঘন্য আচরণ থেকে যেন দূরে সরে থাকে।

কা'বায় পৌঁছার যত পথ আছে, প্রত্যেক পথেই একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই স্থান অতিক্রম করে কা'বার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এহরাম বেঁধে গরীবানা পোশাক পরিধান করে নেবে। এতে আমীর গরীব সকলেই সমান হবে, পৃথক কওম, গোত্র প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে যাবে এবং সকলেই এক বেশে- নিতান্ত দরিদ্রের বেশে এক আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হবে। পবিত্র ভাবধারা সহকারে তারা 'হেরেম শরীফে' প্রবেশ করবে- কোনো রূপ রং-তামাশা, নাচ-গান এবং মেলা আর খেলা দেখার উদ্দেশ্যে নয়। এখানে প্রতি পদে পদে আল্লাহর স্মরণ-আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং কাবা ঘর প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে হয়। আর এখানে একটি মাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, 'হেরেম শরীফের ' প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের প্রতিটি পথে উচ্চারিত হয়ঃ "তোমার ডাকেই হাজির হয়েছি, হে আল্লাহ !আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমারই কাছে এসেছি। সকল তা' রীফ প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। সব নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক- কেউ তোমার শরীক নেই।"

পূত -পবিত্র এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ হজ্জ সম্পর্কে বিশ্বনবী ইরশাদ করেছেন:

যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার লালসা এবং ফাসেকী থেকে দূরে থাকে, সে সদ্যজাত শিশুর মতই (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে। সহিহ বুখারী:১৫২১

হজ্জ কি ও কেনো

হযরত ইব্রাহীম আ.কে আল্লাহতাআলা নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানাও- তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন দুনিয়ার কল্যানের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও খেতে দেবে। সূরা আল হজ্জ: ২৬-২৮

ইব্রাহীম আ.বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র আওয়াজ দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কিভাবে শুনবে? উত্তরে আল্লাহ বলেছিলেন,তুমি ডাক দিয়ে দাও। আওয়াজ পৌছানোর দায়িত্ব আমার।

হজ্জ বান্দাহর উপর মহান আল্লাহর হক।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে, সে যেন তার হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। সূরা আলে ইমরান: ৯৭

হজ্জে গমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর মেহমান।

আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান।আল্লাহ তাদের ডেকেছেন,তারা সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। অতএব, তারা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দিবেন।ইবনে মাজাহ: ২৮৯৩

তিন ব্যক্তি আল্লাহর মেহমান। হাজী, উমরা পালনকারী ও আল্লাহর পথে জিহাদকারী। নাসাঈ: ২৬২৫

হজ্জ জিহাদতূল্য ইবাদাত।

আবু হুরায়রা রা.থেকে বর্ণিত,রাসূল স. বলেছেন, বয়স্ক,শিশু,দূর্বল ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ এবং উমরা পালন করা। নাসাঈ: ২৬২৬

আয়িশাহ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল,মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরয!

রাসূল সা কে বললেন, মেয়েদের উপর এমন জিহাদ ফরয, যাতে লড়াই নেই-তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরাহ পালন করা।আহমাদ: ২৪৭৯৪ ও ইবনে মাজাহ

হজ্জ গুনাহমুক্ত করে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন: "যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করেন, কিন্তু কোন পাপের কথা বা কাজ করেননি সে ব্যক্তি ঐদিনের মত হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল"। সহীহ বুখারী:১৫২১ ও সহীহ মুসলিম ১৩৫০

হজ্জ কি ও কেন

হজ্জের বিনিময় হবে জান্নাত। দারিদ্রতা দূর হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত,রাসূল স. বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন কর। কেননা হজ্জ ও উমরা উভয়টি দারিদ্র্য ও পাপরাশিকে দূরিভূত করে যেমনিভাবে হাপর স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরিচা দূর করে দেয়। আর মাবরুর হজ্জের বদলা হলো জান্নাত। তিরমিযী:৮১০

হজ্জ রিযিকে বরকত এনে দেয়।

বুরাইদা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন,রাসূল স. বলেছেন, হজ্জে খরচ করা আল্লাহর পথে(জিহাদে) খরচ করার সমতূল্য সওয়াব।হজ্জে খরচকৃত সম্পদকে সাতশত গুন বাড়িয়ে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আহমাদ:২২৪৯১ হাদীসটি সহিহ

জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের ঘোষণা।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায় ? সহিহ মুসলিম: ১৩৪৮

নাবালক সন্তানের হজ্জের সাওয়াব হজ্জ সম্পাদনে সহায়তাকারী পাবে।

ইবনে আব্বাস রা.থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,এক মহিলা তাঁর শিশুকে উঁচু করে তুলে ধরে বললো,হে আল্লাহর রাসূল।এই শিশুর হজ্জ কি শুদ্ধ হবে? তিনি বললেন,হ্যা, তবে তুমি তার সওয়াব পাবে। সহিহ মুসলিম: ৩১১৭

এক নামাযে লক্ষ নামাযের সওয়াব নিহিত।

মসজিদুল হারামে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে (এ সালাতটি) এক লক্ষ বার আদায়ের চেয়েও বেশী সওয়াব। তবে মসজিদে নববী ব্যতীত। আহমাদ

জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

আবু হুরায়রা রা.থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল স.আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ করবে। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর কি হজ্জ করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অত:পর রাসূল স. বললেন,আমি যদি হ্যা বলতাম,তাহলে তা (প্রতি বছরের জন্যেই) ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। তিনি আরো বললেন, যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি সে বিষয় সে রুপ থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশী বেশী প্রশ্ন করার ও তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারনেই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই আমি যখন তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে, আর যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করবে। সহিহ মুসলিম:৩১২০

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মাঝে হজ্জ একটি বিশেষ স্তম্ভ।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা.হতে বর্ণিত, নবী করীম সা বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত:

১। এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর এ সাক্ষ্য দান করা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

২। নামায প্রতিষ্ঠা করা ৩। যাকাত প্রদান করা। ৪। রামাদানে সিয়াম পালন করা ৫। এবং আল্লাহর ঘরের (কাবা ঘর) হজ্জ করা সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

হজ্জ আদায় না করার পরিণতি--

তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাবার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ (তা) প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। সুরা আলে ইমরান: ৯৭

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার মধ্যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে:

আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে। সহীহ জামে আত তিরমিযী

যার কোনো প্রকাশ্য অসুবিধা নেই, কোন যালেম বাদশাও যার পথ রোধ করেনি এবং যাকে কোন রোগ অসমর্থ করে রাখেনি - এতদসত্ত্বেও সে যদি হজ্জ না করেই মরে যায়, তবে সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মরতে পারে।দারেমী,বায়হাকী,যাদে রাহ-৫২

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাখ্যা করে বলেছেন:

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করেনা, তাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করতে ইচছা হয়, কারণ তারা মুসলমান নয়, মুসলমান নয়।

আল্লাহ তায়ালার উল্লিখিত ইরশাদ এবং রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তারঁ খলিফার এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, হজ্জ করা সামান্য ফরয নয়। তা আদায় করা না করা মুসলমানদের ইচ্ছাধীন করে দেওয়া হয়নি।বস্তুত যে সব মুসলমানদের কা'বা পর্যন্ত যাওয়া আসার আর্থিক সামর্থ আছে ,শারীরিক দিক দিয়েও যারা অক্ষম নয় তাদের পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য । তা না করে কিছুতেই মুক্তি নেই।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা ফরয হজ্জের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা তোমাদের কেউই এ কথা জানে না যে,তার ভাগ্যে কী রয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. রিয়াওয়াত করেছেন এই হাদীসটি।

হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলেমগণ হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে এ শর্তগুলোপাওয়া গেলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে; আর পাওয়া না গেলে হজ্ব ফরজ হবে না। এমন শর্ত- পাঁচটি।

সেগুলো হচ্ছে- ইসলাম, আকল (বুদ্ধিমত্তা), বালেগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সামর্থ্য থাকা।

১। ইসলাম: এটি যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত। যেহেতু কাফেরের কোন ইবাদত শুদ্ধ নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:"তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)।"[সূরা তওবা, আয়াত: ৫৪]

২ ও ৩. আকলবান ও বালেগ হওয়া: দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তিন শ্রেণীর লোকের উপর থেকে (শরয়ি দায়িত্বের) কলম তুলে নেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি; সজাগ না হওয়া পর্যন্ত। শিশু;তার স্বপ্নদোষ না হওয়া পর্যন্ত। পাগল; তার হুঁশ ফিরে আসা পর্যন্ত।" [সুনানে আবু দাউদ (৪৪০৩), শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

অতএব, শিশুর উপরে হজ্ব নেই। তবে শিশুর অভিভাবক যদি তাকে নিয়ে হজ্ব আদায় করে তাহলে তার হজ্ব শুদ্ধ হবে। সে শিশু যেমন সওয়াব পাবে তেমনি তার অভিভাবকও সওয়াব পাবে। হাদিসে এসেছে- এক মহিলা একটি শিশুকে উপরে তুলে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: এর জন্য কি হজ্ব আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ। আপনিও প্রতিদান পাবেন।"[সহিহ মুসলিম]

হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত কি কি?

ইসলাম, আকল (বুদ্ধিমত্তা), বালেগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সামর্থ্য থাকা।

৪. স্বাধীন হওয়া: অতএব, ক্রীতদাসের উপর হজ্ব নেই। যেহেতু ক্রীতদাস তার মনিবের অধিকার আদায়ে ব্যস্ত।

৫. সামর্থ্য থাকা: আল্লাহ তাআলা বলেন: "এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

আয়াতে কারীমাতে উল্লেখিত সামর্থ্য শারীরিক সামর্থ্য ও আর্থিক সামর্থ্য উভয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শারীরিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় শরীর সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত সফরের কষ্ট সইতে সক্ষম হওয়া। আর আর্থিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় বায়তুল্লাহতে আসা-যাওয়া করার মত অর্থের মালিক হওয়া। স্থায়ী কমিটি বলেন (১১/৩০)

হজ্বের সামর্থ্য হলো- ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহতে পৌঁছার মত যানবাহন যেমন- বিমান, গাড়ী, সওয়ারী ইত্যাদির মালিক হওয়া অথবা এগুলোতে চড়ার মত ভাড়ার অধিকারী হওয়া এবং যাদের ভরণপোষণ দেয়া ফরজ তাদের খরচ পুষিয়ে হজ্বে আসা-যাওয়া করার মত সম্পত্তির মালিক হওয়া।

নারীর ক্ষেত্রে হজ্ব বা উমরার সফর সঙ্গি হিসেবে স্বামী বা মোহরেম কেউ থাকা। এর সাথে আরো যে শর্তটি যোগ করা যায় সেটা হচ্ছে- বায়তুল্লাহ শরিফে পৌঁছার ব্যয় তার আবশ্যকীয় খরচ, শরয়ি আইনানুগ খরচ, ঋণ ইত্যাদির অতিরিক্ত হওয়া।

শরয়ি আইনানুগ খরচ হচ্ছে- ইসলামি শরিয়া কর্তৃক অনুমোদিত খরচাদি। যেমন ইসরাফ (সাধারণ অপচয়) ও তাবযির (হারাম কাজে ব্যয়)ব্যতীত নিজের খরচাদি, নিজ পরিবারের খরচাদি।যদি কোন ব্যক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ হয়, কিন্তু অন্যদের কাছে নিজের ধনাঢ্যতা জাহির করার জন্য ও ধনীদের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য দামী গাড়ী কিনে এবং তার কাছে হজ্ব করার মত সামর্থ্য না থাকে তার উপর দামী গাড়ীটি বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে হজ্ব করা ফরজ হবে এবং সে তার সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল মূল্যের অন্য একটি গাড়ী কিনে নিবে। কারণ এই দামী গাড়ী শরয়ি আইনানুগখরচের মধ্যে পড়বে না। বরঞ্চ এটি ইসরাফ (সাধারণ অপচয়) এর পর্যায়ে পড়বে যা ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ।

খরচের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো- হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের খরচ পোষানোর মত সামর্থ্য থাকা এবং ফিরে আসার পর তার নিজের ও নিজ পরিবারের খরচ চালানোর মত সামর্থ্য থাকা যেমন- বাসা ভাড়া, বেতন বা ব্যবসা ইত্যাদি ঠিক থাকা। তাই যে ব্যবসার লাভ থেকে ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের খরচ চালায় সে ব্যবসার মূলধনভেঙ্গে হজ্ব করা ফরজ নয়; যদি ব্যবসার মূলধন কমে গেলে যে লাভ পাওয়া যাবে সে লাভ তার নিজের খরচ ও পরিবারের খরচের জন্য যথেষ্ট না হয়।

মৌলিক প্রয়োজন কোনগুলো: মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে জিনিশগুলো একান্ত প্রয়োজন। যেগুলো ছাড়া চলতে কষ্ট হয়। যেমন- কোন তালিবে ইলমের কিতাব-পুস্তক। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বিয়েও পড়বে। যদি বিয়ের প্রয়োজন থাকে তাহলে হজ্বের উপর বিয়েকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অন্যথায় হজ্বকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

হজ্বের আর্থিক সামর্থ্য বলতে বুঝাবে ঋণ পরিশোধ, আইনানুগ খরচ ও মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর পর হজ্ব করার মত সম্পদ থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে হজ্ব করার সামর্থ্য রাখে অনতিবিলম্বে হজ্ব আদায় করা তার উপর ফরজ। আর যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে অক্ষম অথবা শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু নিঃসম্পদ গরীব তার উপর হজ্ব ফরজ নয়। আর যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে সক্ষম; কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম তার বিষয়টি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ: যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার মত হয়(যেমন এমন রোগ যে রোগ ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে) তাহলে সে ব্যক্তি সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করবে। সুস্থ হওয়ার পর হজ্ব আদায় করবে। আর যদি তার অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার আশা না থাকে (যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী অথবা বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি; যার হজ্ব করার মত শক্তি নেই)এমন ব্যক্তির উপর প্রতিনিধির মাধ্যমে হজ্ব আদায় করা ফরজ। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও আর্থিক সামর্থ্য থাকায় এ ব্যক্তি হজ্বের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবেন না।

নারীর উপর হজ্ব ফরজ-

নারীর উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য সঙ্গি হিসেবে কোন মোহরেম পুরুষ থাকা শর্ত। কোন পুরুষ মোহরেম ছাড়া ফরজ হোক নফল হোক হজ্ব আদায় করার জন্য কোন নারীর সফর করা জায়েয নয়।

দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "কোন নারী মোহরেম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া সফর করবে না।" [সহিহ বুখারী (১৮৬২) ও সহিহ মুসলিম (১৩৪১)]

মোহরেম পুরুষ: স্বামী অথবা এমন কোন পুরুষ যার সাথে বিবাহ-বন্ধন চিরতরে হারাম ঔরসজাত কারণে অথবা দুগ্ধপানের কারণে অথবা বৈবাহিক আত্মীয়তার কারণে। বোনের স্বামী (দুলাভাই), খালার স্বামী (খালু), ফুফুর স্বামী (ফুফা) মোহরেম নয়। কিছু কিছু নারী এ ব্যাপারে শিথিলতা করে বোন ও বোন জামাই এর সাথে সফর করেন অথবা খালা-খালুর সাথে সফর করেন– এটি হারাম। যেহেতু বোন জামাই বা খালু মোহরেম নয়। তাই এদের সাথে সফর করা জায়েয নয় এবং এভাবে হজ্ব করলে হজ্ব মাবরুর না হওয়ার আশংকা অধিক। কারণ মাবরুর হজ্ব হচ্ছে- যে হজ্বের মধ্যে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। এই নারী তার গোটা সফরেই গুনাতে লিপ্ত।

মোহরেম এর ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- তাকে আকলবান ও সাবালক হতে হবে। কারণ মোহরেম থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মোহরেম ব্যক্তি যেন নারীকে হেফাযত করতে পারে। শিশু ও পাগলের পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। অতএব, কোন নারী যদি মোহরেম না পান অথবা মোহরেম পাওয়া গেলেও সে মোহরেম যদি তাকে নিয়ে সফরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে নারীর উপর হজ্ব ফরজ হবে না। হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ শর্ত নয়। বরং স্বামী অনুমতি না দিলেও যদি হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন (১১/২০):

সামর্থ্যের শর্তগুলো পূর্ণ হলে হজ্ব ফরজ। এ শর্তগুলোর মধ্যে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ নেই। স্ত্রীকে হজ্বে যেতে বাধা দেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নয়। বরং স্ত্রীকে এই ফরজ ইবাদত আদায়ে সহযোগিতা করা শরিয়তের বিধান। সমাপ্ত।

অবশ্য এটি ফরজ হজ্বের প্রসঙ্গে। নফল হজ্বের ব্যাপারে ইবনুল মুনযির 'ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, স্বামীর অধিকার রয়েছে নফল হজ্ব থেকে স্ত্রীকে বাধা দেয়ার। যেহেতু স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পূর্ণ করা ফরজ। সুতরাং অন্য কোন ফরজ আমল ছাড়া এই অধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। [মুগনী (৫/৩৫)] দেখুন: আল-শারহুল মুমতি (৭/৫-২৮) সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

উমরাহ-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

উমরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত; যার অর্থ কোনো স্থানের যিয়ারত করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময় মসজিদুল হারামে গমন করে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে উমরাহ বলা হয়।

আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''উমরাহ; এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু পাপ (সগীরা) কাজ ঘটবে তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত করে)''। সহীহ বুখারীঃ ১৬৫০

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''নিশ্চয় রমযান মাসের উমরাহ একটি হজের সমান''। মিশকাতঃ ২৫০৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''রমযান মাসে উমরাহ পালন করা -আমার সাথে হজ করার ন্যায়''। সহীহ বুখারীঃ ১৮৬৩; সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬ ও ৩০৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনদশায় ৪ বার উমরাহ করেছেন।মিশকাত ২৫১৮

হাজ্জ ও উমরাহ-২য় পর্ব

আসসালামু'আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি
ওয়া বারাকাতুহ

হজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত বই সমূহ

যারা হজ্জ বা উমরাতে যেতে চান এখন থেকেই কিছু পড়াশুনা করুন। যেমন—

১। হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায় সহীহ বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ থেকে ধারাবাহিকভাবে পড়া শুরু করুন। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নোট আপনার ডায়রীতে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে নিতে পারেন।

২। পবিত্র কুর'আন বুঝে পড়া শুরু করুন। বিশেষ করে হজ্জ সংক্রান্ত সূরাগুলো পড়ুন (সূরা বাকারা, সূরা হজ্জ, সূরা আস সাফাত) তাফসীরসহ।

৩। কুর'আন পড়তে যেয়ে দোয়া ভিত্তিক আয়াতগুলো আপনার ডায়রীতে তুলে নিতে পারেন ধারাবাহিকভাবে।

৪। রাসূলের স: এর জীবনী বই (আর-রাহীকুল মাখতুম) পড়া শুরু করুন। প্রয়োজনীয় তথ্য দাগিয়ে নিতে পারেন।

৫। মক্কা-মদিনার ইতিকথা বই পড়ে নিলে আরো ভাল হয়।

৬। যারা হজ্জ করে এসেছেন সমসাময়িককালে তাদের সাথে আলাপ করুন। তবে এইক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে অনেকে কিন্তু ভুলতথ্য নিয়ে হজ্জ করে এসেছেন নিজেও জানে না।

৭।এখন ইন্টারনেট থেকে হজ্জের নিয়ম জানারও সুযোগ রয়েছে, সহীহ সাইট থেকে জানতে পারেন। যেমন Islamhouse.com /islamQA

পবিত্র মক্কার ইতিহাস: শাইখ ছফীউর রহমান মোবারকপুরী। (পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৮৩)

- নারীর হজ ও উমরা-লেখক : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
  প্রকাশক: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ
- হজ্জের আধ্যাতিক শিক্ষাঃ ড আব্দুল্লাহ জাহাংগির
- হজ্জ ও ওমরাহ পকেট
  লেখক : শাইখুল আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
- হজ্জ সফরে সহজ গাইডঃ মোঃ মোশফিকুর রহমান
- হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারত-
  শাইখ আবদুল্লাহ আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায

* হাজ্জ উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত
  লেখক : শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহঃ)
* উমরা মদীনা যিয়ারত দোআ
  লেখক : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

- আহায্যুকা সাহিহুন (আপনার হজ শুদ্ধ হচ্ছে কি?):
  লেখকঃ শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী
- হজ ও উমরাহ: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
- ছহীহ হজ উমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা: আকরামুজ্জামান ইবন আব্দুস সালাম।
- আল্লাহর আহবানে বায়তুল্লাহর অতিথির সাড়া
  হে আল্লাহ আমি হাযির –ডা মাহবুবা রেহানা রাহীন

হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি

হজ্জের যাবার জন্য কিছু পূর্ব প্রস্তুতি থাকা দরকার। এত বড় একটি এবাদত যা আমার আপনার শারীরিক অর্থনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়কে কাজে লাগাতে হয়, সেই এবাদতটা অবশ্যই যেন শুধু মক্কা-মদিনা যাওয়া আসার মধ্যে না হয় এবং তা যেন জীবনের রাস্তাকে পরিবর্তন করে একমুখী হয়ে মহান আল্লাহর দেয়া সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত হয় সেইভাবে নিজেকে তৈরী হতে হবে। তাই আমাদের থাকা দরকার—

- ব্যক্তিগত প্রস্তুতি----মানসিক ও শারীরিক
- পারিবারিক দায়িত্ব
- সামাজিক অবস্থান

মানসিক প্রস্তুতি

১।প্রথমেই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে, এটা হজ্জে যারা যেতে চান তাদের জন্য ওয়াজিব।

একমাত্র উদ্দেশ্য হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

২। নিজের সকল প্রকার গুনাহ হতে তাওবাতুন নাসূহার জন্য জলদি করা তার জন্য ওয়াজিব মনে করতে হবে।

সকল অন্যায় ও গুনাহগুলি স্মরন করত এমন খাঁটিভাবে একাগ্রতার সাথে তাওবাহ করবে, যেন সেই অন্যায়গুলি পুনরায় সংঘটিত না করার জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায়।

৩। অসিয়ত করে যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"কোন মুসলিমের যদি কোন কিছু অসিয়ত করার থাকে তার জন্য এটা উচিত হবে না যে, সে অসিয়ত না করে দু'টি রাত যাপন করে"।বুখারি: ২৫৮৭, মুসলিম: ১৬২৭

শারীরিক প্রস্তুতি

শারীরিক প্রস্তুতি খুবই জরুরী। সুস্থ্যতা আল্লাহতা'আলার দেয়া একটি বড় নি'আমত। সুস্থ্য থেকে হজ্জের সব আহকাম নিজে করতে পারাটা মহান আল্লাহতা'আলার দেয়া একটি বিরাট সাহায্য। তাই দোয়া করার সাথে সাথে নিজের সুস্থ্যতার জন্য শরীরের দিকে যত্নশীল হতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করুন তাহলে মহান আল্লাহই আপনাকে সুস্থ্যতার সাথে হজ্জের কাজ সমাধা করিয়ে দিবেন ইনশা'আল্লাহ। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে দুয়া করুন।

এখন থেকে শারীরিক কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

এখন থেকে একটু হাঁটার অভ্যাস করুন তাহলে হজ্জের সময় হাঁটাটা স্বাভাবিক মনে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হলো মা-বোনদের মাসিক ঋতুস্রাব। এইক্ষেত্রে অনেকে প্রথমবারের মত হরমোনের ঔষধ খেয়ে থাকেন বন্ধ রাখার জন্য।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এর প্রস্তুতি:

পরিবারের জন্য এখন থেকে কিছু নির্দেশনা দিতে থাকুন। যেমন:

- প্রথমেই আপনার অনুপস্থিতিতে যিনি অভিভাবক হিসেবে থাকবেন, একজন পরহেজগার হোন সেইভাবে মনোনিত করুন।
- বাড়ির যে পরিচারিকা আছে বা রেখে যাবেন তাকেও পরহেজগার দেখে নিন বা শিক্ষা দিন।
- সন্তানদের একটি নেক আমলের পরিকল্পনা তৈরী করে দিন যেন আপনাদের অনুপস্থিতিতে সেই অনুযায়ী আমল করে।
- সন্তানদের বুঝান, তাদের সহযোগীতায় মানসিকভাবে প্রশান্তির সাথে হজ্জ করতে পারলে তারাও সওয়াব পাবে ইনশা'আল্লাহ।
- পরিবারের বাড়ির নিরাপত্তার জন্য যা করা প্রয়োজন তা এখন থেকে গুছিয়ে নিন।
- বাজার রান্না স্কুল/কলেজ ইত্যাদি সব নির্দেশনা সুন্দর করে গুছিয়ে এখন থেকে একটু করে করিয়ে নিন সেই ভাবে।
- আমাদের সমাজে একটি প্রচলন আছে যে, হজ্জে যাওয়ার পূর্বে সবার সাথে দেখা করে ক্ষমা চাওয়া, দেখা যায় সারা জীবনেও এমন মানুষদের দেখা নাই তাদের সাথে যেয়ে দেখা করে মাফ চাওয়া এবং এটাকে করনীয় একটা অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক করে নেয়া হয়।

আসলে আমাদের সবার কাছে সব সময়ের জন্য ক্ষমা ও ঋনমুক্ত থাকা দরকার কারন যে কোন সময়েই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে,শুধু হজ্জে গেলেই নয়।

- আত্মীয়ের ব্যাপারে আমরা দাওয়াত করে খাবার খাওয়ানো এবং কিছু বৈষয়িক উপহার দেয়াটাকে দায়িত্ব মনে করেই শেষ।

অথচ আত্মিয়ের মুল হক হলো ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করা। শুভাকাংখী হয়ে এই সংক্রান্ত বই উপহার দেয়া যেন তারা জান্নাতের পথে চলতে পারে-এটাই হলো সত্যিকার ভালোবাসা যা আখেরাতে সহায়ক।

একটু চিন্তা করুন। আপনার আমার অনুপস্থিতিতে এই ঘরে (যা নিজের সংসার) কি হচ্ছে বা কি শিক্ষার ধারা দিয়ে গিয়েছেন যা পরিবারের অন্য সদস্যরা কি সেই ভাবে নিজেদের পরিচালিত করছেন!!

হাজ্জ থেকে ফিরে আসতে পারাটাও মহান আল্লাহর হুকুম। সব অবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার। তাই প্রথমেই স্বীয় পরিবার-পরিজনদের এবং সংগী-সাথীগনকে তাকওয়ার জন্য নসীহাত করা যেন মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনে অনুগত থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে। সূরা আত তাহরীম:৬

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা প্রত্যেকই রাখাল এবং তাকে তার অধিনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল। তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

মহান আল্লাহতা'আলার সাহায্যে সাহস রাখুন এবং আশা করুন সুস্থ্যভাবেই হজ্জ করে আসতে পারবেন ইনশা'আল্লাহ। লাখ লাখ মানুষ হজ্জ করে ফিরে যাচ্ছেন দেশে মহান আল্লাহতা'আলার সাহায্যে।

হজ্জ ও উমরার আহকাম ও কার্যাবলী

	ফরয সমূহ	ওয়াজীব সমূহ	হজ্জের সুন্নাত সমূহ
উমরাহ	১। ইহরাম করা। ২। কাবাঘর তাওয়াফ করা। ৩। সাঈ করা	১। মীকাত পার হওয়ার আগেই ইহরাম করা। ২। চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডানো। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ কাটা।	১। ইহরামের পূর্বে গোসল করা ২। পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা ৩। তালবিয়্যা পাঠ করা ৪। ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা ৫। ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করার পর দু'আ করা ৬। ইফরাদ হাজীদের তাওয়াফে কুদূম করা। ৭। তাওয়াফে কুদূমে ইযতেবা ও রমল করা ৮। সাফা-মারওয়ার সাঈর সময় সবুজ চিহ্নিত স্থানে পুরুষদের দৌড়ানো ৯। তাওয়াফ শেষ দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত সমূহের কোন একটি ছুটে গেলে দম বা কাফফারা দিতে হবে না।
হজ্জ্ব	১। ইহরাম করা ২। আরাফাতে অবস্থান (৯ই যিলহজ্জ) ৩। তাওয়াফ করা (তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ইফাদাহ) ৪। সাফা-মারওয়া সা'ঈ করা; হজের ফরয সা'ঈ করা।	১। ইহরাম করতে হবে মীকাত পার হয়ার আগেই। ২। আরাফাতে অবস্থান সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়ীত করা। ৩। মুযদালিফায় অবস্থান করা। ৪। মীনায় রাত্রি যাপন। ৫। জামরা সমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ৬। হাদী (পশু) কুরবানী করা। ৭। চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডানো। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ কাটা। ৮। বিদায়ী তাওয়াফ। (হায়েয বা নেফাস শুরু হয়ে গেলে নারীদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে-বুখারী)	

উমরাহ

অনেকে শুধু উমরা করতেও মক্কায় সফর করে থাকেন বছরের অন্যান্য সময়ে। হজ্জের উদ্দেশ্যে যাবার পরও উমরা করতে হয়।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: এক উমরাহ আদায়ের পর পরবর্তী উমরাহ আদায় করা (এ দু' উমরাহর) মধ্যবর্তী গোনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা। আর মকবুল হজ্জের (যে হজ্জ আল্লাহর কাছে কবুল হয়) পুরস্কারই হচ্ছে জান্নাত। সহীহ আল-বুখারী:১৬৪৭

মহান আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি ও রাসূল(সঃ) এর দেখানো নিয়মে সব কাজ করতে হবে, তবেই সেই কাজ আমলে সালেহ এর মাঝে গন্য হবে ইনশা'আলাহ।

উমরার জন্য ফরয কাজ তিনটি---

১। নিয়্যত মুখে উচচারন করে করা- আল্লাহুম্মা লাব্বায়িকা উমরাতান/ লাব্বায়িকা উমরাতান

২। কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা।

৩। সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা।

উমরার জন্য ওয়াজিব কাজ দুইটি---

১। মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা (বাংলাদেশীদের জন্য ইয়ালামলাম যা একটি পর্বতের নাম)

২। হালাক বা তাকসীর অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পুরুষরা মাথা নেড়া বা চুল ছোট করা এবং মহিলাদের জন্য চুলের গোছার শেষাংশ থেকে আংগুলের মাথার শেষ গিট(এক আংগুল) পরিমান চুল কাটতে হবে বা সমগ্র চুল একত্র করে ঐ পরিমান কাটতে হবে।

মীকাত

কাবা শরীফ গমনকারীদেরকে কাবা হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়, যে স্থানগুলো নবীজির হাদীস দ্বারা নির্ধারিত আছে। ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়। হারাম শরীফের চর্তুদিকেই মীকাত রয়েছে।

হজ্জের জন্য মীক্বাতের স্থান সমূহ হচ্ছে পাঁচটিঃ ১) যুল হুলায়ফা ২) জুহ্ফা ৩) ইয়ালামলাম ৪) কারণে মানাযেল ৫) যাতু ঈরক্ব।

১) যুল হুলায়ফাঃ যাকে বর্তমানে আবা'রে আলী বলা হয়। ইহা মদীনার নিকটবর্তী,এটি মদীনাবাসী এবং সেপথ দিয়ে গমণকারী অন্যান্যদের মীক্বাত।

২) জুহ্ফাঃ শাম তথা সিরিয়াবাসীদের মক্কা গমণের পথে পুরাতন একটি গ্রামের নাম জুহ্ফা।

৩) ইয়ালামলামঃ একটি পাহাড় বা স্থানের নাম ইয়ালামলাম। বর্তমানে এস্থানকে সা'দিয়া বলা হয়। এখান থেকে ইহরাম বাঁধে সেগুলো হল : (ক) ইয়ামেন, (খ) বাংলাদেশ, (গ) ভারতবর্ষ, (ঘ) চীন, (ঙ) ইন্দোনেশিয়া, (চ) মালয়েশিয়া, (ছ) দক্ষিণ এশিয়াসহ পূর্বের দেশসমূহ।

৪) কারণে মানাযেলঃ নজদ তথা পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের মক্কা গমণের পথে তায়েফের কাছে একটি পাহাড়ের নাম।

৫) যাতু ইরক্বঃ ইরাকের অধিবাসীদের মক্কা আগমণের পথে একটি স্থানের নাম।

মীকাত হলো সীমা। হজ ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকারীদের কা'বা ঘর হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে ইহরাম করতে হয়, ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়। যে স্থানগুলো নবীজির হাদীস দ্বারা নির্ধারিত আছে।

মীকাতের নাম	অন্য নাম	মক্কা থেকে দূরত্ব	যাদের জন্য
যুল হুলায়ফা	আবিয়ারে আলী	৪২০ কিমি	মদীনাবাসী ও যারা এ পথ দিয়ে যাবেন।
আল জুহফাহ	রাবিগ	১৮৬ কি.মি.	সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, মরক্কো ও সমগ্র আফ্রিকা।
ইয়ালামলাম	আস-সা'দিয়া	১২০ কি.মি	যারা নৌপথে ইয়েমেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে আসবেন।
কারনুল মানাযিল	সাইলুল কাবির	৭৮ কি.মি.	কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক ও ইরান। আর যারা বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে জিদ্দা যাবেন তাদের জন্যও এটি মীক্বাত।
যাতু ইরক	-	১০০ কি.মি	ইরাক (আজকাল পরিত্যাক্ত)

বাংলাদেশ থেকে যারা বিমান যোগে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তাদের মীকাত হলো 'কারনুল মানাযিল' (সাইলুল কাবীর)। আর নৌপথ যোগে যারা জাহাজে ভ্রমণ করবেন তাদের মীকাত হবে 'ইয়ালামলাম'। তবে আজকাল নৌপথ বেশি ব্যবহৃত হয় না। যারা মীকাতের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই হজের ইহরাম করবেন। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরাহ করতে চান তা হলে তাকে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে যেমন তান'ঈম তথা আয়েশা মসজিদ বা অনুরূপ কোনো হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরাম করবেন।

ইহরাম

ইহরাম শব্দের অর্থ হারাম বা নিষিদ্ধ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থা ধারন করতে হলে মীকাত থেকে বা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে কিছু কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

ইহরামের ৩টি শর্ত

১। মীকাত থেকে ইহরাম করা

২। পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন কাপড় পড়া

৩। তালবিয়্যা পড়া(ইহরাম শুরু করার পর পরই) তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে,অনেকের মতে এটা সুন্নাত।

ইহরাম বাঁধার জন্য করনীয় প্রস্তুতি, তা হলো:

- নখ কাঁটা
- বগল ও নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা
- গোসল করা বা অযু করা, পরিচ্ছন্ন হওয়া। তবে গোসল করাই উত্তম।
- পুরুষেরা শরীরে সুগন্ধী লাগানো সুন্নত কিন্তু এহরামের কাপড়ে লাগাবেন না। মেয়েরা সুগন্ধি লাগাবে না।
- পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধান করবেন । সেলাইবিহীন চাদরের মত দুটুকরো কাপড় একটি নিচে পরবে এবং অন্যটি গায়ে পড়বে। টুপি,গেঞ্জি,জাঙ্গিয়া পড়বেন না।কিন্তু মেয়েদের জন্য যেমন ইচ্ছা কাপড় পরিধান করতে পারেন তবে চাকচিক্য, ফিতনা সৃষ্টিকারী পোষাক যেন না হয়। যেহেতু পুরুষরা সাদা কাপড় পরিধান করেন তাই ভীরের মাঝে মহিলা হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্য সাদা ছাড়া অন্য রঙের কাপড় পড়লে ভালো।

হাত মোজা থাকবেনা, মুখের নেকাব(যা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা হয়) খোলা থাকবে তবে ওড়না বা কাপড়ের কিছু অংশ দ্বারা প্রয়োজনে পর-পুরুষ থেকে পর্দার জন্য ব্যবহার করবে।

- পুরুষদের পায়ের গোড়ালি ঢেকে রাখে এমন কোন জুতা বা মোজা পড়া যাবে না। সেন্ডেল পড়তে পারবে।
- গোসল বা অযুর পর দুরাক'আত সুন্নত নামাজ(যা তাহিয়্যাতুল অযুর নামাজ) পড়ে উমরার নিয়্যত মুখে উচচারন করে করা। যদি ফরয সালাত আদায়ের পর হলে আলাদা করে আর কোন সালাত পড়া লাগবে না।

ক। শুধু উমরার ক্ষেত্রে বলতে হয়- লাব্বাইকা উমরাহ

খ। শুধু হজ্জের ক্ষেত্রে বলতে হয়- লাব্বাইকা হাজ্জা

গ। কিরান হজ্জের ক্ষেত্রে উমরা ও হজ্জের কথা একত্রে বলতে হয়- লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জা

ঘ। ইফরাদ হলে বলতে হয়- লাব্বাইকা হাজ্জা

ঙ। বদলি উমরা হলে বলতে হয়- লাব্বাইকা উমরা আন(ফুলান)-ফুলানের জায়গায় ব্যক্তির নাম বলবেন

চ। বদলি হজ্জ হলে বলবেন- লাব্বাইকা হাজ্জান আন (ফুলান)-ফুলানের জায়গায় ব্যক্তির নাম বলবেন।

ছ। তামাতু হজ্জের জন্য প্রথমে শুধু উমরার নিয়্যত করবেন। পরে ৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের নিয়্যাত করবেন।

যদি আশঙ্কা থাকে যে কোন বাঁধার সম্মুখীন (অসুস্থতা, শত্রুতা বা অন্য কোন কারনে) হতে পারে তাহলে নিয়্যত করার সময় এই ভাবে শর্ত করে বলতে হবে-যদি আমি বাঁধাপ্রাপ্ত হই তাহলে বাঁধাপ্রাপ্ত স্থান হবে আমার মাহল(এহরাম খোলার স্থান)। তাহলে হজ্জ বা উমরা পালন করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হন তাহলে সেস্থানে এহরাম খুলে ফেলতে পারবেন তাতে কোন ফিদইয়া নেই।

• এরপর তালবিয়া পড়া সুন্নাত। তালবিয়া হলো—

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক লা শারীকা লাক্।

আমি হাযির, হে আল্লাহ ! আমি হাযির, আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমারই কাছে এসেছি। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। কেউ তোমার শরীক নেই।"

পুরুষেরা জোরে তালবিয়া পড়বেন কিন্তু নারীরা পর-পুরুষের সামনে জোরে পড়বেন না।

তালবিয়া পাঠ কতক্ষন পর্যন্ত করবেন--

১। উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামের নিয়্যত শেষ হলেই তালবিয়া পড়া শুরু এবং হারাম শরিফে পৌছে তাওয়াফ শুরুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে।

২। হজ্জের বেলায় ১০ই যিলহজ্জে বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবে।

রাসূল স.কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ধরনের হজ্জ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, চিৎকার করা (উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ) ও রক্ত প্রবাহিত করা (কোরবানী দেওয়া)।জামে আত তিরমিযী:৭৭৫

ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ বৈধ------

• কখনো আপনার ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা কিংবা পরিস্কার করা এবং মাথা ও শরীর ধৌত করা জায়েয। এর ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন চুল পড়ে গেলে তাতে আপনার কোন অসুবিধা নেই।
• ফোঁড়া গালানো, প্রয়োজনে দাঁত উঠানো,অপারেশন করা যাবে।
• পানিতে মাছ ধরা ও মোরগ,ছাগল গরু ইত্যাদি জবাই করতে পারবে।
• মানুষের জন্য ক্ষতিকারক প্রানী যেমন: হিংস্র কুকুর, চিল, কাক, ইদুঁর, সাপ, বিচ্ছু, মশা-মাছি ও পিঁপড়া মারা জায়েয। নাসাঈ:২৮৩৫
• বেল্ট, আংটি, ঘড়ি, চশমা, কানের শ্রবন যন্ত্র, মানিব্যাগ ইত্যাদি ব্যাবহার করতে পারবে।
• ছাতা, তাবু, গাড়ি,ঘর বা যেকোন ছায়ার নিচে বসতে পারবে।
• সুগন্ধিবিহীন সাবান দিয়ে গোসল ও হাত ধোয়া যাবে।
• সুগন্ধিবিহীন তেল ব্যাবহার করা যাবে।
• ঠান্ডা লাগলে গলায় মাফলার ব্যবহার করতে পারবে।

ইহরাম অবস্থায় যে সব কাজ নিষেধ এর কোন একটি কাজ ভুলে বা না জেনে করে ফেললে কোন দম বা ফিদইয়া দিতে হবে না, স্মরণ হওয়া মাত্র বা অবগত হওয়ার সাথে সাথে এ কাজ থেকে বিরত হয়ে যাবে এবং এ জন্য ইস্তিগফার করবে। তবে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

উযরবশত: একান্ত বাধ্য হয়ে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাথার চুল উঠায় বা কেটে ফেলে তাহলে ফিদইয়া দিতে হবে। উলামায়ে কিরামের কিয়াস অনুসারে মাথা ছাড়া অন্য অংশ থেকে চুল উঠালে বা কাটলে বা নখ কাটলেও ফিদইয়া দিতে হবে।

ফিদইয়া/ দম হলো---(বিনা ওজরে মাথা কামানো, আতর লাগানো ইত্যাদি)

• হারাম এলাকার মধ্যে একটি পশু (উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ/ পূর্ণ এক ছাগল/ পূর্ণ এক ভেড়া) যবেহ করা যা কোরবানির উপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ গোশত
মিসকিন ও গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া
• তিনদিন রোযা রাখা
* ৬জন মিসকিনকে (প্রত্যেককে ১কেজি ২০ গ্রাম পরিমান) একবেলা খাওয়ানো

ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট ভুলসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহরাম না বাধা।
২. ইহরামের কাপড় পাল্টানো যাবে না-এ ধারণা পোষণ করা, প্রকৃতপক্ষে ইহরামের কাপড় যখন ইচ্ছা তখন পাল্টানো যাবে।
৩. ইহরামের শুরু থেকে ইযতিবা করা। (ইযতিবা মানে হচ্ছে- পুরুষের জন্য: ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদরটা ডান বগলের নীচ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর ফেলে দেয়া।) অথচ শুধুমাত্র তাওয়াফের সময় ইযতিবা করা সুন্নত। তাও যদি সেটি তাওয়াফে কুদুম হয়। তাওয়াফে কুদুমকে বাংলায় আগমনী-তাওয়াফ বলা যেতে পারে।
৪. ইহরামের জন্য বিশেষ নামাজ পড়াকে ওয়াজিব মনে করা।

যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়গুলো করে ফেলে তার কি করা উচিৎ?

কোনো মহিলা যদি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুগুলো করে ফেলে তখন তার তিনটি অবস্থা থাকতে পারে:

১। সে তা ভুলে বা অসাবধানতাবশত. অথবা জোরকৃত হয়ে বা ঘুমন্ত অবস্থায় করে ফেলে তবে তার কিছুই করার নেই। সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। : দো'আ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"হে আমাদের রব! আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করে বসি তবে সে জন্য আপনি আমাদের পাকড়াও করবে না" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] কিন্তু যখনই সেই ওজর শেষ হয়ে যাবে তখন থেকে আর তা করা যাবে না। যেমন মূর্খ ব্যক্তি জানার পর, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার পর, বিস্মৃত ব্যক্তি মনে হওয়ার পর সে ধরনের গুনাহ আর করতে পারবে না।

২। আর যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো কোনো ওজর থাকার কারণে করে তবে সে গুনাহ থেকে মুক্তি পেলেও তাকে সেগুলোর জন্য ফিদিয়া দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

"আর যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা মাথায় ব্যথা হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা ওটার ফিদিয়া দেবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজের পূর্বে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য 'হাদী' জবেহ করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

৩। যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে করে তবে সে গুনাহগার, হওয়ার পাশাপাশি সেগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট ফিদিয়া দিতে হবে।

ফিদিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি:

১। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে শুধু গুনাহ হয় ফিদিয়া দেওয়ার বিধান রাখা হয়নি এবং তা হলো, বিয়ে করা বা দেওয়া। এতে ব্যক্তি গুনাহগার, হবে এবং সে বিয়ে বাতিল বা ফাসেদ হবে কিন্তু কোনো ফিদিয়া দিয়ে মুক্তি পাওয়ার বিধান রাখা হয় নি।

২। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে একটি পূর্ণ উট, অথবা গরু ফিদয়া হিসেবে জবাই করতে হয় তা হলো, পাথর মেরে প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে সহবাস করা। মূলত: এ ধরনের সহবাসের কারণে মোট চারটি কাজ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়:

এক. হজ বাতিল হয়ে যাবে। দুই. ফিদিয়া দিতে হবে, আর তা হলো, একটি পূর্ণ উট, বা গরু। তিন. যে হজটি করছে তা পূর্ণ করতে হবে। চার. আগামীতে সে হজের কাজা করতে হবে।

৩। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে এর সমপরিমাণ প্রতিবিধান করতে হয়-- কোনো স্থল প্রাণী শিকার করা। যেমন, হরিণ শিকার বা খরগোশ শিকার করা। এটা করলে শিকারকৃত প্রাণীর অনুপাতে জন্তু জবাই করতে হবে।

৪। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে সাওম (রোযা) বা সাদকা বা একটি ছাগল/দুম্বা জবাই করতে হবে। আর তা হলো, উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্যান্য কাজগুলোর কিছু করা। যেমন, বিনা ওজরে মাথা কামানো, আতর লাগানো। ইত্যাদি। রোজার পরিমাণ হলো, তিনদিন। আর সাদকার পরিমাণ হলো, ছয়জন মিসকিনকে তিন সা' পরিমাণ খাবার দেওয়া। (এক সা'= কমপক্ষে ২০৪০ গ্রাম)।

তাওয়াফ

শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা বা চক্কর দেয়াকে তাওয়াফ বলে।

মহান আল্লাহ বলেছেন-

আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। সূরা বাকারা:১২৫

আর তারা যেন প্রাচীন ঘর কাবা তাওয়াফ করে। সূরা আল হাজ্জ:২৯

রাসূল স. বলেছেন,

কেউ যদি যথাযথভাবে বায়তুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে তবে তার একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব হয়। তাওয়াফ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যখনই তার কদম রাখে,তখনই প্রতি কদমে তার একটি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং একটি করে নেকী লিখা হয়। সহিহ জামে আত তিরমিযী:৯০১,হাসান হাদীস

তাওয়াফের শর্ত----

১। অযু ও পবিত্রতার সাথে তাওয়াফ করা
২। মনে মনে তাওয়াফের ইরাদা বা নিয়ত করা
৩। হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা
৪। সাত চক্র পূর্ণ করা
৫। মসজিদে হারামের ভিতরে থেকে তাওয়াফ করা
৬। কাবাকে বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করা
৭। সতর ঢাকা, মহিলাদের হিজাব থাকা।

মহাবিশ্বের বৃহৎ শক্তির চারদিকে সকল ছোট বস্তু আবর্তন করে বা আল্লাহ কেন্দ্রিক মানবের জীবন বা মহান আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়ামতের চারপাশে মানুষের বিচরণ বা এক আল্লাহ নির্ভর জীবনযাপনের গভীর অঙ্গিকার ব্যক্ত করা - এসবকিছুরই প্রতীক হচ্ছে তাওয়াফ। তাওয়াফ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতাকেই বুঝায়।

যদিও বেশিরভাগ উত্তম কাজ ডান থেকে বামে করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে বাম ধার ধরে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং দেহের রক্ত চলাচল বাম থেকে ডানে হয়।

সাধারণত তাওয়াফ ৪ ধরনের। যথা –

তাওয়াফুল কুদুম (ইফরাদ ও ক্বিরান হাজীর প্রথম তাওয়াফ/তামাত্তু হাজীর উমরাহর তাওয়াফ),
তাওয়াফুল ইফাদাহ/যিয়ারাহ (হজের ফরয তাওয়াফ),
তাওয়াফুল বিদা (হজের বিদায় তাওয়াফ) ও
নফল তাওয়াফ (ঐচ্ছিক তাওয়াফ)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘মসজিদে হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে (মসজিদে নববী) সালাত অন্য স্থানে সালাতের চেয়ে ১ হাজার গুণ উত্তম, আর মসজিদে হারামে সালাত ১ লক্ষ সালাতের চেয়ে উত্তম’’।
ইবন মাজাহঃ ১৩৯৬

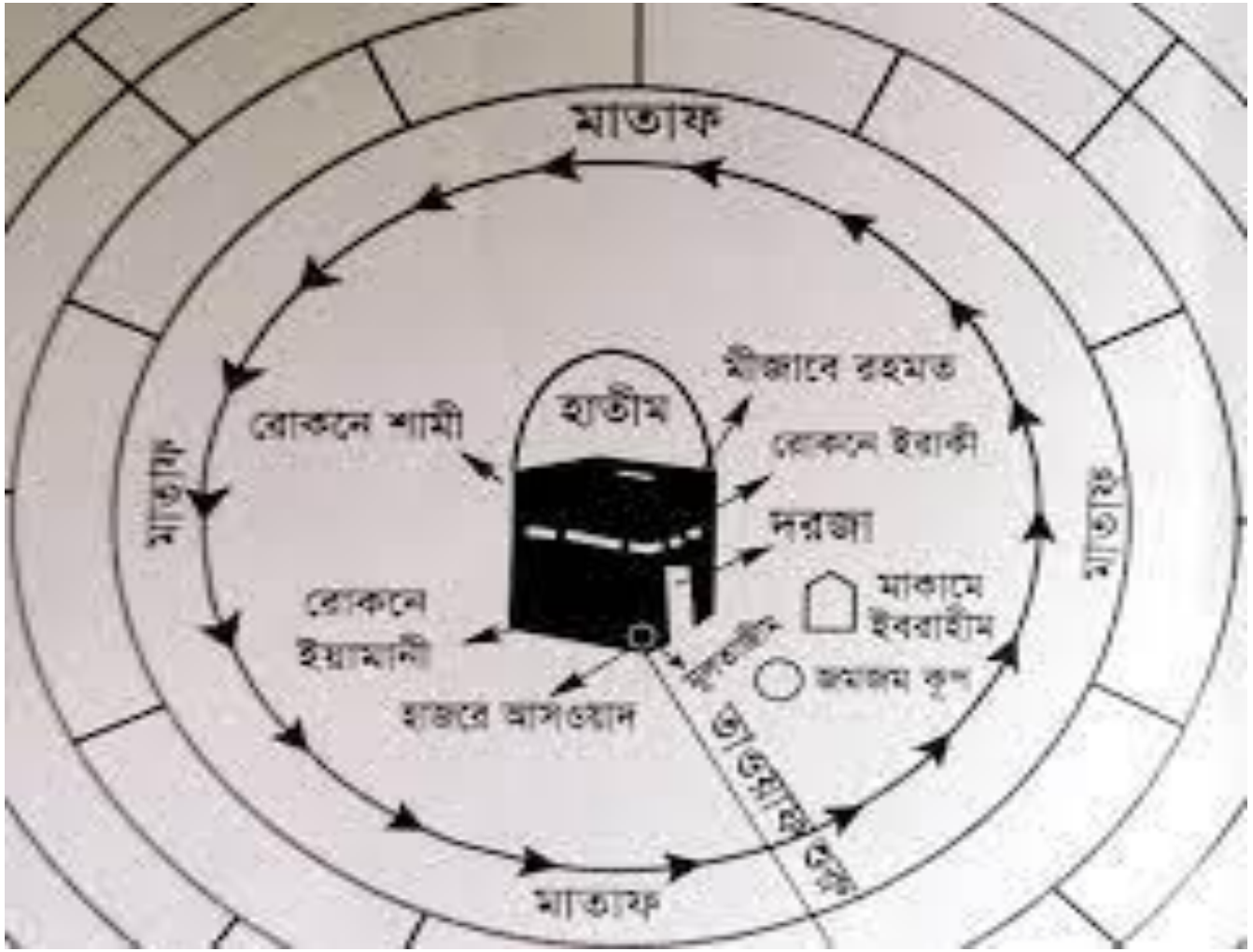

রাসূল স. বলেছেন,
হজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শ গুনাহগুলোকে সম্পূর্ণরুপে মুছে দেয়।
জামে আত তিরমিযী

হজরে আসওয়াদ পাথরটি জান্নাত থেকে আসা একটি পাথর,আর এটি বরফের চেয়েও সাদা ছিল, কিন্তু শির্কপন্থীদের পাপ এটিকে কালো বানিয়ে দিয়েছে। জামে আত তিরমিযী

আসওয়াদকে কিয়ামতের দিনে উত্থিত করবেন। তার দুটি চক্ষু থাকবে,যা দিয়ে সে দেখতে পাবে,একটি জিহবা থাকবে,যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে স্পর্শ করেছে সত্যিকারভাবে এই পাথর সাক্ষ্য প্রদান করবে।
জামে আত তিরমিযী

কা‘বা ঘর ও এর চারপাশে তাওয়াফের জায়গা বেষ্টন করে যে মসজিদ স্থাপিত তা মসজিদুল হারাম নামে পরিচিত।
কা‘বা ঘরের চারপাশে তাওয়াফের জায়গার মেঝেকে মাতাফ বলা হয়। কা‘বা ঘরের তাওয়াফ শুরু করার কর্নারটি হাজরে আসওয়াদ কর্নার নামে পরিচিত। এর ডান পাশের কর্নারটি ইরাকি কর্নার, তার ডান পাশের কর্ণারটি শামি কর্নার এবং তার ডান পাশের কর্ণারটি ইয়েমেনী কর্নার নামে পরিচিত।

তাওয়াফের পদ্ধতিঃ

তাওয়াফের পূর্বে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হতে হবে। মক্কার আসার পরে ও তাওয়াফের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে শুধু ওযু করলেও চলবে। ওযু ছাড়া বা হায়েয নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়। ইহরামের বিধি-নিষেধ স্মরণ রাখবেন এবং বেশি বেশি তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবেন।

ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন এবং এ দো'আ পাঠ করুন: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اَللهم افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

''বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা''।

''আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।
হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিন''।

উমরাহর নিয়তে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে 'তাহিয়াতুল মসজিদ' সালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সরাসরি তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু অন্য কোনো সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় না করে মসজিদে যেন কেউ না বসেন; তবে কোনো সালাতের ইকামত হয়ে গেলে সেই সালাতে শামিল হয়ে যাবেন।

মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে কা'বার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। যখনই কা'বা শরীফ চোখে পড়বে তখনই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে তাওয়াফের প্রস্তুতি নিন ও তাওয়াফের নিয়ত মনে মনে করুন।

তাওয়াফ শুরুর স্থানে (হাজরে আসওয়াদ কর্নার) যাওয়ার আগে শুধু পুরুষরা তাদের ইহরামের কাপড়ের এক প্রান্ত ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর দিবেন এবং ডান কাঁধ ও বাহু উন্মুক্ত করে দিবেন। একে বলা হয় 'ইদতিবা''। সাত চক্করেই এমনটি করা সুন্নাত। মেয়েদের কোনো ইদতিবা' নেই। এ ইদতিবা' শুধুমাত্র (তামাত্তু হাজীর) উমরাহর তাওয়াফ এবং (ক্বিরান ও মুফরিদ হাজীর) তাওয়াফে কুদুমের সময় করতে হয়। আর অন্য কোনো তাওয়াফের সময়ের জন্য ইদতিবা' করা প্রযোজ্য নয়।শুধুমাত্র পুরুষেরা চক্করের শুরুতে দৃঢ়তার সাথে বীর বেশে কাঁধ হেলিয়ে প্রথম তিন চক্কর সম্পন্ন করবেন অর্থাৎ; একটু দ্রুত ও ক্ষুদ্র কদমে বুক টান করে জগিং করে/হেঁটে 'রমল' করে চক্কর সম্পন্ন করবেন, এমনটি করা সুন্নাত।

হাজরে আসওয়াদ এর দিকে মুখ করে ডান হাত উচু করে হাজরে আসওয়াদের দিকে সোজা ধরে বলুন: '' بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُবিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার''।

হাজরে আসওয়াদ পাথর চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম ও এমনটি করা সুন্নাত। তবে যদি চুমু খেতে না পারেন তাহলে ডান হাত দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করে আপনার হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করতে পারেন।

তাওয়াফের পদ্ধতিঃ

তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো‘আ নেই। তাওয়াফরত অবস্থায় আপনি ইচ্ছে করলে কুরআন তিলাওয়াত, দো‘আ, যিকির, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আল্লাহর প্রশংসা করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পড়ুন। সব দো‘আ যে আরবীতে করতে হবে তার কোনো নিয়ম নেই, যে ভাষা আপনি ভালো বোঝেন ও আপনার মনের ভাব প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দো‘আ করুন

খুব বেশি প্রয়োজন ব্যাতিরেকে তাওয়াফের সময় কথা না বলাই শ্রেয়।

তাওয়াফরত অবস্থায় প্রতি চক্করে ইয়েমেনী কর্নারে পৌঁছানোর পর আপনি ডান হাত অথবা দুই হাত দিয়ে কা‘বার ইয়েমেনী কর্নার শুধু স্পর্শ করবেন (এমনটি করা সুন্নাত), তবে ভিড়ের কারণে এটা করা সম্ভব না হলে কোনো সমস্যা নেই। আপনি চক্কর চালিয়ে যাবেন। দূর থেকে হাত উঠিয়ে ইশারা করবেন না বা চুম্বন করবেন না কিংবা আল্লাহু আকবারও বলবেন না।

- প্রত্যেক চক্করে ইয়েমেনী কর্নার থেকে হাজারে আসওয়াদ কর্নার এর মাঝামাঝি স্থানে থাকাকালে এ দো‘আ পাঠ করা মুস্তাহাব ও সুন্নাত:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাববানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা আযাবান নার’’।

‘‘হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন’’। সূরা আল-বাকারা: ২:২০১

প্রথম এক চক্কর শেষ করে হাজরে আসওয়াদ কর্নার পৌঁছার পর আবার আগের মতো করে দূর থেকে ডান হাত উচু করে তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবেন। এক্ষেত্রে শুধু মনে রাখবেন ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ না বলে শুধু বলবেন ‘আল্লাহু আকবার’। এমনটি পরবর্তী সকল চক্কর এর শুরুতে বলবেন। উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী সাত চক্কর শেষ করবেন। এভাবে আপনার তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। তাওয়াফ শেষে মাতাফ থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে কোনো ফাঁকা স্থানে অবস্থান গ্রহন করুন।

তাওয়াফ শেষ হওয়া মাত্রই পুরুষরা তাদের ডান কাঁধ ইহরামের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবেন। এবার আপনি ‘ইদতিবা‘’ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

তাওয়াফের সময় যদি অযু ভেঙ্গে যায় তখন সম্ভব হলে মসজিদের ভেতরে দ্রুত অযু করে আবার তাওয়াফ শুরু করবেন। যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু করবেন। কিন্তু যদি বেশি সময় ক্ষেপন করে ফেলেন বা বাইরে অযু করতে যান তবে আবার পুনরায় নতুন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম।

তাওয়াফ শেষে আপনি সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমে পেছনে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী সেখানে সালাত আদায় করেছেন। আয়াতে এসেছে,

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ [البقرة: ١٢٥]

‘‘আর তোমরা ইবরাহীমের দণ্ডায়মানস্থানকে সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো’’। সূরা আল-বাকারা: ২:১২৫

সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে অথবা ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাত সালাত আদায় করুন। এ সালাতের প্রথম রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-ইখলাস পড়া সুন্নাত। তিরমিযী, হাদীস নং ৮৬৯

এ সালাত তাওয়াফের কোনো অংশ নয় বরং এটি একটি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত।

এবার যমযম কুপের পানির টেপ অথবা কন্টেইনারের কাছে গিয়ে পেট ভরে পানি পান করুন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালুন। এখানে এখন যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাই সুন্নাত বলে কোনো কোনো আলেম মত প্রকাশ করেছেন, কারণ এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অন্য আলেমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযরের কারণে এখানে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন। কারণ, তিনি মানুষের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, সেখানে বসার সুব্যবস্থা ছিল না।

যমযমের পানি কয়েক ঢোকে পান করা উত্তম। খুব ঠাণ্ডা পানি পান না করে নরমাল (Not cold) পানি পান করা উত্তম।

ইবনে আববাস (র) এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন,‘ - إذا شربت منها فاستقبل القبلة و اذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله .

যখন তুমি যমযমের পানি পান করবে, কেবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, ও তিন বার নিশ্বাস নিবে। তুমি তা পেট পুড়ে খাবে ও শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দোয়া পড়তেন,

‘.اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ, ও সকল রোগ থেকে শেফা কামনা করছি’। দারা কুতনী
- পানি পান করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ ((ﷺএরূপ করতেন। কিতাবুল মুগনি ফিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ : ৩১০
- যমযমের পানি পান করে সাঈ করার জন্য প্রস্তুতি নিন।

সা’ঈ যেভাবে করবেন

সাঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো ও চেষ্টা করা। পরিভাষায় সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে দৌড়ানোকে সাঈ বলে।
কাবার অতি নিকটেই দু’টো ছোট্ট পাহাড় আছে যার একটি ’সাফা’ ও অপরটির নাম ’মারওয়া’। এ দু’ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে মা হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাঈল এর পানির জন্য ছোটাছুটি করেছিলেন। ঠিক এ জায়গাতেই হজ্জ ও উমরা পালনকারীদেরকে দৌড়াতে হয়। শাব্দিক অর্থে দৌড়ানো হলেও পারিভাষিক অর্থে স্বাভাবিক গতিতে চলা। শুধুমাত্র দুই সবুজ পিলার দ্বারা চিহ্নিত মধ্যবর্তী স্থানে সামান্য একটু দৌড়ের গতিতে চলতে হয়। তবে মেয়েরা দৌড়াবে না।ঋতুবতী মহিলারা সা‘ঈ করতে পারবেন, কারণ সা‘ঈ এলাকা মসজিদুল হারামের কোনো অংশ নয়।

সাঈর শর্ত ও ওয়াজিবসমূহ কি কি?

(১) প্রথমে তাওয়াফ এবং পরে সাঈ করা।
(২) ’সাফা’ থেকে শুরু করা এবং ’মারওয়া’য় গিয়ে শেষ করা।
(৩) ’সাফা’ ও ’মারওয়া’র মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা। একটু কম হলে চলবে না।
(৪) সাত চক্র পূর্ণ করা।
(৫) সাঈ করার স্থানেই সাঈ করতে হবে। এর পাশ দিয়ে করলে চলবে না।

সাঈর সুন্নাত কী কী?

উঃ- (ক) অযু অবস্থায় সাঈ করা ও সতর ঢাকা।
(খ) তাওয়াফ শেষে লম্বা সময় ব্যয় না করে সঙ্গে সঙ্গে সাঈ শুরু করা।
(গ) সাঈর এক চক্র শেষ হলে লম্বা সময় না থেমে পরবর্তী চক্র শুরু করা।
(ঘ) দু’টি সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের একটু দৌড়ানো।
(ঙ) প্রতি চক্রেই সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু’টিতে আরোহণ করা।
(চ) সাফা ও মারওয়া পাহাড় এবং এর মধ্যবর্তী স্থানে যিক্‌র ও দোয়া করা।
(ছ) সক্ষম ব্যক্তির পায়ে হেঁটে সাঈ করা।

সাফা পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা কাছাকাছি পৌছে এ দো‘আটি শুধুমাত্র এখন একবারই পড়ুন :সাফা পাহাড়ের কাছে যেয়ে পাহাড়ে উঠার সময় নিচের আয়াতটি প্রথমচক্রের শুরুতে পড়া, প্রতি চক্রের শুরুতে বার বার পড়ার প্রয়োজন নেই,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)

“ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা‘আয়িরিল্লাহ, আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি”।
“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম।
আমি আরম্ভ করছি যেভাবে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন”। সূরা আল-বাকারা: ২:১৫৮ এবার কা‘বা শরীফের দিকে মুখ করে কা‘বার দিকে দুই হাত উঠিয়ে এ দো‘আটি তিনবার পাঠ করুন:

সা’ঈ যেভাবে করবেন

এবার কা‘বা শরীফের দিকে মুখ করে কা‘বার দিকে দুই হাত উঠিয়ে এ দো‘আটি তিনবার পাঠ করুন -সহীহ মুসলিম, ২১৩৭

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ –

وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শারিকালাহ্, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বদীর।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শারিকালাহু, আনজাযা ওয়া‘দাহু ওয়ানাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু”।

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।

তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং দুষ্কর্মের সহযোগীদের পরাস্ত করেছেন”। আবু দাউদ ১৯০৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২/২২২

পদ্ধতি এমন হবে যে, উক্ত দো‘আটি প্রথমে একবার পাঠ করে তারপর আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দো‘আ পড়বেন। ফের উক্ত দো‘আটি পড়ে আবার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দো‘আ পড়বেন। শেষ আর একবার এমনভাবে দো‘আ পড়বেন। অর্থাৎ তিন বার এভাবে করবেন।

সা”ঈ করার সময় দোয়া ও যিকর করা যাবে। প্রতি চক্রে নির্দিষ্ট কোন দোয়া ঠিক করা নেই। সবার জন্য দোয়া করা যাবে।

সবুজ চিহ্নিত দুই দাগের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার জন্য দোআটি হল :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

রাব্বিগফির,ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ’আযযুল আকরাম

হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি দয়া করুন, আপনিতো পরাক্রমশালী মহিমাময়।

মারওয়ায় গিয়ে যখন ৭চক্র পূর্ণ হবে, এরপর চুল মুণ্ডানো বা চুল কাটার কাজ করলে উমরাহর কাজ পূর্ণ হবে।

সাঈ শেষ করে মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হউন এবং নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করুন:
«اَللهم إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»
‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক’’।
‘‘হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি’’।
সাঈ শেষ করার পর মাথার সব অংশ থেকে সমানভাবে চুল ছেঁটে (কসর) কাটতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মাথা মুড়ানোই (হালক্ব) উত্তম কাজ।

রাসূল স. বলেছেন, হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডন কারীদের মাফ করে দাও। সাহাবীরা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি বললেন: হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। তারা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি তৃতীয়বারও বললেন, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। এরপর বললেন, চুল কর্তনকারীদের মাফ করে দাও।সহিহ বুখারী:১৭২৭

মহিলাদের চুল অন্য মহিলা(যে ইহরাম থেকে মুক্ত আছে) সে কেটে দিতে পারে অথবা স্বামী নিজের চুল কাটার পর স্ত্রীর চুল কেটে দিবেন

• হারামের সীমানায় যেকোন জায়গায় চুল কাটতে পারেন তবে উত্তম হলো উমরা পালনকারী মারওয়ার আশে পাশে এবং হজ্জের সময় হাজী মীনায় থাকা অবস্থায় চুল কাটা।

এইভাবেই চুল কাটার মাধ্যমে ইহরাম খোলা হয়ে যায় ও উমরাহ কার্য সম্পাদন শেষ হয়।

হাজ্জ ও উমরাহ-৩য় পর্ব

আসসালামু'আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি
ওয়া বারাকাতুহ

হজ সফরের জন্য ৩টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব্যাগে নিতে বলা হয়েছিল! ধৈর্য, ত্যাগ ও ক্ষমা! হজকে সহজ করার জন্য এ ৩টি বিষয় প্রয়োগ করা খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে।

হজ্জের (তামাত্তু) ফরয বা রুকন ৪টি।

১। ইহরাম করা
২। আরাফাতে অবস্থান (৯ই যিলহজ্জ)
৩। তাওয়াফ করা (তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ইফাদাহ)
৪। সাফা-মারওয়া সা'ঈ করা; হজের ফরয সা'ঈ করা।

উপরোক্ত ফরয কাজগুলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হবে। উপরোক্ত ফরয বা রুকনের কোনো একটি বাদ গেলে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) হজ সম্পন্ন হবে না। কোনো ক্ষতিপূরণ বা দম দিয়ে কাজ হবে না। হজ বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তীতে পুনরায় নতুন করে হজ করতে হবে।

হজ্জের ওয়াজিব ৮টি (তামাত্তু হজ্জ)

১। ইহরাম করতে হবে মীকাত পার হওয়ার আগেই।
২। আরাফাতে অবস্থান সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়ীত করা।
৩। মুযদালিফায় অবস্থান করা।
৪। মীনায় রাত্রি যাপন।
৫। ক্রমধারা রক্ষা করে জমরাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করা।
৬। হাদী (পশু) কুরবানী করা।
৭। চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডানো। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ কাটা।
৮। বিদায়ী তাওয়াফ। (হায়েয বা নেফাস শুরু হয়ে গেলে নারীদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে-বুখারী)

উল্লেখিত ওয়াজিবসমূহের মধ্যে কোন একটি যে কোন কারনেই ছুটে গেলেই বা বাদ পরে গেলে দম বা কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়।
দম বা কাফফারা আদায় করতে হয় যেভাবে—উমরা বা হজ্জের কোনো একটি ওয়াজিব ছুটে গেলে এর পরিবর্তে একটি খাসি,দুম্বা বা বকরি যবাই করে দিতে হয়।
এটি মিনায় বা মক্কায় দিতে হয়। এর গোশত শুধুমাত্র ফকির-মিসকীনরা খাবে, দমদাতা নিজে খাবে না।
অজানা ও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য দম দিতে হয় না, শুধুমাত্র ওয়াজিব তরক করলে দম দিতে হবে।

হজ্জের প্রধান সুন্নাত সমূহ

১। ইহরামের পূর্বে গোসল করা
২। পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা
৩। তালবিয়্যা পাঠ করা
৪। ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা
৫। ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করার পর দু'আ করা
৬। ইফরাদ হাজীদের তাওয়াফে কুদূম করা।
৭। তাওয়াফে কুদূমে ইযতেবা ও রমল করা
৮। সাফা-মারওয়ার সাঈর সময় সবুজ চিহ্নিত স্থানে পুরুষদের দৌড়ানো
৯। তাওয়াফ শেষ দুই রাকাত সালাত আদায় করা

সুন্নাত সমূহের কোন একটি ছুটে গেলে দম বা কাফফারা দিতে হবে না।

হজ্জের প্রকারভেদ: ৩ প্রকার

১। তামাত্তু ২। কিরান। ৩। ইফরাদ

তামাত্তু হজ্জ: তামাত্তু শব্দের অর্থ হলো কিছু সময়ের জন্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করা। প্রথমত : 'তামাত্তু' হল হজ্জের সময় প্রথমে উমরা করে হালাল হয়ে ইহরামের কাপড় বদলিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। এর কিছু দিন পর আবার মক্কা থেকেই ইহরাম বেধে হজ্জের আহকাম পালন করা।

দ্বিতীয়ত : 'কিরান' হল উমরা ও হজ্জের মাঝখানে হালাল না হওয়া এবং ইহরামের কাপড় না খোলা। একই ইহরামে আবার হজ্জ সম্পাদন করা।

তৃতীয়ত : 'ইফরাদ' হল উমরা করা ছাড়াই শুধুমাত্র হজ্জ করা।

হজ্জে যাওয়ার পর হেরেম শরীফে থাকাকালীন ইবাদাত

অনেকে নির্ধারিত হজ্জের তারিখের অনেক পূর্বে মক্কায় চলে আসার সুযোগ করে থাকেন। এটা মহান আল্লাহর অশেষ রহমত যে, হজ্জের দিনগুলি আসার পূর্বে এখানে অবস্থান করে নিজেকে, পুরু সময় শুধুমাত্র মহান রবের সান্নিধ্যে যেয়ে প্রিয় বান্দা হবার সুযোগ লাভ করে থাকেন। দুনিয়ার সব দায়িত্ব থেকে অন্তত কিছু দিনের জন্য মুক্ত থেকে নিজের অন্তরকে যাচাই করার সুযোগ আসে যে, মহান রবের প্রতি আমার কতটুকু ভালোবাসা আছে, ইচ্ছা করলে আমি নিজেকে আরো কত সুন্দর করে মহান রবের দরবারে নিজেকে সঁপে দিতে পারি! কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে অনেক সময় অনেকে এই সুন্দর দিনগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারেন না এবং পরে খুব আফসোস করে থাকেন। তাই পুর্ব থেকেই সুচিন্তিত পরিকল্পনা রাখা প্রয়োজন যে,আমার এই সময়গুলো কিভাবে কাজে লাগাবো! জীবনের এই দিনগুলোর মত আবার সুযোগ নাও আসতে পারে,হতে পারে এই দিনগুলোর ইবাদাতই আমার শেষ ইবাদাত। যতটুকু সম্ভব ইবাদাতে মশগুল থাকাটাই উত্তম। হজ সফরের জন্য ৩টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব্যাগে নিতে বলা হয়েছিল! ধৈর্য, ত্যাগ ও ক্ষমা! হজকে সহজ করার জন্য এ ৩টি বিষয় প্রয়োগ করা খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে।

জীবনের এই মূল্যবান সময়টুকু যেন এইভাবে কাজে লাগান যায় যে—

- শুধুমাত্র মহান আল্লাহর যিকর
- স্বীয় গুনাহের কথা মনে করে বারবার ইস্তেগফার পড়া
- বিনয় সহকারে তাঁর করুণা প্রার্থনা করা
- পবিত্র কুর'আন পাঠ করে এর অর্থ অনুধাবন করা
- জামায়াতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল হওয়া
- স্বীয় জিহবাকে বাজে কথার উচ্চারণ ও কথা বার্তা থেকে সংযত রাখা
- অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও অতিরিক্ত তামাশামূলক কথাবার্তা হতে নিজেকে বিরত রাখা
- স্বীয় রসনাকে মিথ্যা কথন,গীবত ও চোগলখোরী হতে বিরত রাখা
- স্বীয় সহচর ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে হাস্যাস্পদ করার মত অবস্থা হতে নিজেকে সংযত রাখা
- হজ্জযাত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা,তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা রাখা
- সাধ্যমত সুকৌশলে মিষ্টি ভাষায় ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও অপ্রিয় কাজ থেকে বিরত থাকার নসীহত করা
- যতটা পারেন পুরু সময়টা মহান আল্লাহতা'আলার ঘরের সামনে থাকার চিন্তা রাখুন, আর মন থেকে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া চাইতে থাকুন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

সবর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা দেয়া, বিরত রাখা ও বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির আশা-আকাংখাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা বুঝায়, যার ফলে এক ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় নিজের হৃদয় ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অনবরত এগিয়ে যেতে থাকে। এই নৈতিক গুণটিকে নিজের মধ্যে লালন করা এবং বাহির থেকে একে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত নামায পড়া।

(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের অবশ্যি ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক। সূরা আলে ইমরান: ১৮৬

আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহর কাছে এ ধরণের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না। সূরা ইউসুফ:৯০

এবং তাদেরকে বলবে: তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো। কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ! সূরা রাদ:২৪

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন। সূরা হামীম আস সাজদাহ:৩৬

সবরের কয়েকটি ধাপ:

- নিজের আবেগকে সংযত রাখা। মুখ দিয়ে কোন অশালীন কথা না বলা।
- বিপদ আপদে ঘাবড়ে না যাওয়া।
- রাগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ না করা।
- ত্বরা - প্রবনতা (তাড়াতাড়ি হতে হবে) পরিহার করা।
- অশোভন আচরনে উত্তেজিত না হওয়া।
- কাংখিত ফল পেতে দেরী হলে অস্থির না হওয়া।
- প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকা।

মহান আল্লাহতা'আআ কুর'আনে বলেছেন—

সবর ও নামায সহকারে সাহায্য চাও।

সূরা আল বাকারা: ৪৫

৮, ৯, ১০ই যিলহজ্জে করনীয়

৮ই যিলহজ্জ: এই দিনটিকে বলা হয় "তারউইয়্যার দিন"। ৮ যিলহজ ইহরামের কাপড় পরিধানের পূর্বে সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ (যদি কুরবানী করার ইচ্ছা না থাকে তবে) নখ কাটা, লজ্জাস্থানের চুল পরিস্কার, গোঁফ ছোট করা সেরে নিন। তবে দাঁড়ি ও চুল কাটবেন না। পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো করা মুস্তাহাব। উত্তম হলো কোনো ফরয সালাতের পূর্বে ইহরামের কাপড় পরা ও সালাত আদায় করা এবং তারপর ইহরাম করা। আর কোনো ফরয সালাতের সময় না হলে ইহরামের কাপড় পড়ে তাহিয়্যাতুল ওযুর ২ রাকাত সালাত পড়া। সালাতের পর ইহরাম করা মুস্তাহাব। মক্কায় আপনার হোটেল অথবা বাসা থেকে ইহরামের কাপড় পরবেন এবং এখান থেকেই আপনি ইহরাম বাঁধবেন। এমনটি করা ওয়াজিব।নিয়্যত হবে আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান বা লাব্বাইকা হাজ্জান।

হজ্জের ১ম দিন(৮ই যিলহজ্জ)---ইহরাম অবস্থায় মক্কা থেকে মীনায় রওয়ানা—মীনায় ৫ ওয়াক্ত সালাত কসর আদায়(আজকের যুহর,আসর,মাগরিব,ইশা ও পরদিন ফযর অথবা আজকের ফযর,যোহর,আসর,মাগরিব ও ইশা)---মীনায় রাতে অবস্থান।

হজ্জের ২য় দিন(৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন)----------ফযরের সালাত পড়ে(বা অনেক ক্ষেত্রে ফযরের আগেই) আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশ্যে তাকবীরে তাশরীক পড়তে পড়তে রওয়ানা---আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থান—ওয়াক্তমত যোহর ও আসরের কসর সালাত আদায়----সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া ও যিকিরে মশগুল থাকুন(বিশেষ করে এই দোয়াটি পড়ুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ...)---সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্য রওয়ানা -----মুযদালিফায় পৌছে মাগরিব ও ইশা সালাত কসর পড়ুন----বড় জামরায় মারার জন্য ৭টি কঙ্কর যোগাড় করুন—খোলা আকাশের নীচে বিশ্রাম নিন।

হজ্জের ৩য় দিন(১০ই যিলহজ্জ ঈদের দিন)-----মুযদালিফায় ফযরের সালাত পড়ে কিবলামুখী হয়ে তাসবিহ তাহলীল ও হাত উঠিয়ে দোয়া করা---আকাশ ফর্সা হয়ে গেলে সূর্য উঠার আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা(রাতে না পেরে থাকলে ৭টি কঙ্কর এখন যোগাড় করতে পারেন)---বেশী বেশি তালবিয়া ও আল্লাহু আকবার পড়তে পড়তে চলুন--ওয়াদী মুহাসসির স্থানে দ্রুত হাটুন---মীনায় তাবুতে গিয়ে নাস্তা সেরে ও ব্যাগ গুছিয়ে হালকা করে নিন— সূর্য হেলার পূর্বেই বড় জামারায় পৌছা মাত্র তালবিয়া পড়া বন্ধ---৭টি কঙ্কর মারার পর কুরবানী করুন--- পুরুষেরা চুল মুণ্ডন ও মহিলারা চুল কাটবেন---মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা—তাওয়াফে ইফাদা বা ফরয তাওয়াফ করুন—সাঈ করুন---মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা—মীনায় রাত্রী যাপন

হজ্জের ৪র্থ দিন(১১ই যিলহজ্জ)-ফরয তাওয়াফ, সাঈ,কুরবানী মাথা মুন্ডন না করে থাকলে আজ করুন----সূর্য হেলার পরে এবং সূর্য ডুবার আগে ৩টি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন-১ম ছোট জামারা কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন—মেঝো জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন—বড় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন----রাতে মীনায় অবস্থান করুন।

হজ্জের ৫মদিন(১২ই যিলহজ্জ)-- ফরয তাওয়াফ, সাঈ,কুরবানী মাথা মুন্ডন না করে থাকলে আজ করুন------সূর্য হেলার পরে এবং সূর্য ডুবার আগে ৩টি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন-১ম ছোট জামারা কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন—মেঝো জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করুন------ বড় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন----সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই মীনা ত্যাগ করতে হবে—সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ না করতে পারলে মীনার তাবুতে রাত্রী যাপন করতে হবে।

হজ্জের ৬ষ্ঠ দিন(১৩ইযিলহজ্জ)---- গতদিন সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ যারা করতে পারেন নি তারা আজ ৩টি জামারায় ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই মীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে আসবেন--- আসরের সালাত পড়ে তাকবির তাশরীক পড়ুন, এরপর আর পড়তে হবে না।

মক্কার শেষ দিন----- বিদায় তাওয়াফ করে দেশে রওয়ানা বা মদীনা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

(তাকবীর হলো- ‘‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার,লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহীল হামদ’’।

তাকবীর কখন ও কতদিন পড়তে হবে এ ব্যাপারে অনেকগুলো মত রয়েছে। সাধারণভাবে যা বুঝা যায় তা হলো যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ (আরাফার দিন ফজর থেকে) থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন সময়ে তাকবীর পড়া যেতে পারে এবং বিশেষভাবে ফরয সালাতের পর(বিশেষ সময়ের তাকবীর) পড়া মুস্তাহাব।)

হজের সময় মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার ভিতরের ও বাইরের লোকদের নিয়ে কসর করে সকল সালাত পড়েছেন।তাবুর ভিতরে গ্রুপ জামাআত করা উত্তম অথবা একা একাও সালাত পড়তে পারেন। খাইফ মসজিদের কাছাকাছি তাবুর অবস্থান হলে মসজিদে গিয়ে জামা‘আতে সালাত আদায় করা সবচেয়ে উত্তম। মিনার খাইফ মসজিদ ঐতিহাসিক মসজিদ।

মহিলারা মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি খোলা রাখবেন, নেকাব দ্বারা মুখমণ্ডল সবসময় ঢাকা রাখা যাবে না। তবে না-মাহরাম পুরুষদের সামনে বা মাঝে গেলে তখন মুখমণ্ডল আবৃত করবেন।

মসজিদে নামিরাতে খুৎবা শেষ করার পরে যোহর ও আসরের আযান দেওয়া এবং সালাত পড়া।
৯ যিলহজ সূর্যোদয় পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

হজ সম্পন্ন করতে না পারার ভয় থাকলে (যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা, বাধা অথবা অসুস্থতার কারণে না পারেন) তবে এ দো‘আ পাঠ করবেন:
فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

‘‘ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাসতানি’’।
‘‘যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে’’।

আরাফার দিবসের মর্যাদা

- যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ হলো আরাফার দিন। এই দিনটি হজ্জ আদায়ের জন্য যারা আরাফার ময়দানে আছেন এবং যারা গমন করেননি-সকল মুসলিমদের জন্যই একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন। কারণ এই দিনে বিশ্বমুসলিমের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা তার নিয়ামত ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ঘোষনা করেন।
  মহান আল্লাহ বলেছেন, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।সূরা আল মায়িদা: ০৩
- আয়িশাহ রা.থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন বৎসরে এমন কোন দিন নেই যে, আল্লাহ আরাফার দিবস অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় স্বীয় বান্দাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করেন এবং তিনি সেদিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হন। তারপর ফেরেশতাদের নিকট গৌরব প্রকাশ করে বলেন, আমার এ বান্দাগণ কি চায়? সহীহ মুসলিম
  ইমাম নবভী রহ. বলেন, এ হাদিসটি আরাফাহর দিবসের ফজিলতের একটি স্পষ্ট প্রমাণ।
- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরাফাতে অবস্থানকারীদের নিয়ে আসমানের অধিবাসীদের কাছে গর্ব করেন। বলেন, আমার এ সকল বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ ! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে।আহমদ ও হাকেম, হাদিসটি সহিহ

লাব্বাইকা উচ্চারণ সহ কুর'আনের তিলাওয়াত করাও উত্তম।
এই আরাফাতে অবস্থানই হজ্জের মূল কাজ। রাসূল স. বলেছেন-
শ্রেষ্ঠ দোআ হচ্ছে এই দিবসের দোআ। আমি এবং নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম কথা হচ্ছে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইয়ূমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।
সহীহ আল বুখারী, মুসলিম
শ্রেষ্ঠ দোআটি বেশী বেশী পড়া সুন্নাত, এর অর্থ হলো- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁরই অধিকারভুক্ত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর প্রাপ্য। তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।
তাছাড়া নীচের দোয়াটি আরো বেশী বেশী পড়া উত্তম :
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه
لاَ شَرِيكَ لَه
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এছাড়া নীচের তাসবীহটি বেশী বেশী পড়বেন।
سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه
وَسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِ
রাসূল স. বলেছেন-
আল্লাহর নিকট চারটি কালাম সর্বাধিক প্রিয়, তা হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার।
দোআগুলো অন্তরে ভয়-ভীতি এবং নরম দিলে খুব বেশী করে মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে। রাসূল স. দোআগুলো তিনবার করে পড়তেন।

আরাফাতের দিন হাজীরা সাওম রাখবে না কারন রাসূল স. সাওম করেন নি।

আরাফার ময়দানে করনীয়—
১। গোসল করে নেয়া,
২। পরিপূর্ণ পবিত্র থাকা, তবে কোন কারন বশত অযুবিহীন ও অপবিত্র থাকলেও আরাফাতে অবস্থান শুদ্ধ হবে।
৩। কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা ও অন্যান্য তাসবীহ পড়া, তওবা-ইস্তিগফার বেশী করে করা
৪। কিছু সময় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে দু'হাত উত্তোলন ও প্রসারিত করে দোয়া করা।
৫। মনকে বিনম্র ও খুশূ-খুযূ রেখে মোনাজাত করা।
৬। দোয়া নিম্ন স্বরে ও একাকী করা উত্তম। তবে কেউ যদি দোয়া করে ও পিছনে কোন লোকসমষ্টি আমীন বলেন তাতে অসুবিধা নেই(শাইখ উসাইমিন)
৭। হায়েজ নিফাস অবস্থায় দোয়া করা যাবে।
৮। দোয়াতে নিজের জন্য / অন্যের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য করবেন।

মুযদালিফায় রাত্রিকালীন অবস্থান

মুযদালিফায় রাত্রিযাপনের আবশ্যকতা ও করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

আর হজ্জের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশআরুল হারাম' (মুয্দালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। সূরা আল বাকারা:১৯৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন, ''আল্লাহ তা'আলা এ দিনে তোমাদের ওপর অনুকম্পা করেছেন, অতঃপর তিনি গুনাহগারদেরকে সৎকাজকারীদের কাছে সোপর্দ করেছেন। আর সৎকাজকারীরা যা চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন'' ইবন মাজাহঃ ৩০২৩

মুযদালিফায় অবস্থান সাদামাটা জীবন যাপন, গৃহহীনতা ও অভাবের প্রতীক। আরাফা থেকে ৬ কি.মি. অতিক্রম করার পর আসে মুযদালিফা।মুযদালিফা এলাকা হারামের সীমার ভিতরে অবস্থিত। মুযদালিফার পর কিছু অংশ ওয়াদি আল-মুহাসসির উপত্যকা এলাকা তারপর মিনা সীমানা শুরু। মুযদালিফায় যখনই পৌছাবেন তখন প্রথম কাজ হলো মাগরিব ও এশার সালাত কসর করে পরপর আদায় করা। সালাত আদায়ের পর আর কোনো কাজ নেই। এবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় সুবহে সাদিক পর্যন্ত শুয়ে ঘুমিয়ে আরাম করেছেন। যেহেতু ১০ যিলহজ হাজীদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে বিশ্রাম করেছেন।

নারীদের মধ্যে যারা দূর্বল তাদের,যারা অক্ষম ও শিশুদের শেষ রাত্রে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সিদ্ধ হবে। এ ছাড়া অন্যসব হাজীদের ফযরের নামায না পড়া পর্যন্ত মুযদালিফাতে অবস্থান করতে হবে।

ফযরের নামাযের পর মাশআরুল হারাম সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং খুব বেশী আল্লাহর যিকর, তাকবীর এবং দোয়া দরুদ পাঠ করতে থাকবে যে পর্যন্ত প্রভাতের আলোকরেখা অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দোয়ার সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব।

মাশআরুল হারাম" একটি পাহাড়ের নাম। এটি মুযদালিফায় অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদও আছে। মাশআরুল হারাম" একটি পাহাড়ের নাম হলেও পুরো মাশআরুল হারামই মুযদালিফা।

এখানে হাজীদের যা করণীয় তা হল :

(১) মাশআরুল হারামের নিকট কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো,

(২) তাকবীর বলা,

(৩) তাসবীহ-তাহলীল পড়া অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহাম্দু লিল্লাহ' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়া।

(৪) যিক্র করা

(৫) প্রাণ খুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা,

(৬) খুশু-খুযু ও বিনম্র হয়ে মাবুদের কাছে আপনার যা চাওয়ার আছে তা চেয়ে নেবেন। বিশেষ করে আপনার মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র-সন্তানাদি ও আপনজন-আত্মীয়স্বজনের জন্যও দোয়া করবেন।

(৭) দোয়ার সময় দুহাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

এভাবে ফজরের নামাযের পর থেকে আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দোয়া করতে থাকা মুস্তাহাব। ভীড়ের কারণে "মাশআরুল হারাম"-এর কাছে যেতে না পারলে মুযদালিফার যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে এভাবে দোয়া করবেন। মাশআরুল হারাম বলতে মুজদালিফাকে বুঝানো হয়েছে বলেছেন আল কুরতুবী, কেউ কেউ বলেছেন কাযাহ পর্বতের নাম মাশআরুল হারাম, অনেকে মুযদালিফার দুই পর্বতের মাঝের ভ্যালীকে(মুহাসসীর ভ্যালী) বুঝিয়েছেন।

মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম ওয়াদী মুহাসসার। এটা মুযদালিফার অংশ নয়। তাই এখানে অবস্থান করা যাবে না। এ মুহাসসার এলাকায় আবরাহা রাজার হাতির বাহিনীকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি কংকর নিক্ষেপ করে নাস্তানাবুদ করেছিল। এখানে কিঞ্চিৎ দ্রুত চলা মুস্তাহাব। বর্তমানে মুযদালিফার একাংশ মিনা হিসাবে ব্যবহার করা হয় হজযাত্রী সংকুলান না হওয়ার কারণে। তাই ঐ জায়গাটুকু মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু মৌলিক অর্থে মিনায় পরিনত হয় নি, তাই ঐ অংশে তাবুতে রাত্রিযাপন করলে মুযদালিফার রাত্রিযাপন হয়ে যাবে। ওয়াদী মুহাসসারেও এখন অবশ্য তাবু বিছিয়ে মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।মুযদালিফার সীমানার ভিতর এ রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। (ওজর ছাড়া মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনায় যাওয়া ঠিক হবে না। চলে গেলে দম দিতে হবে। সহীহ বুখারীঃ ১৫৬৪)

সুন্নাত হলো প্রথম দিনের ৭টি কংকর মাশআরুল হারাম থেকে রওয়ানা দেয়ার পর মুযদালিফা থেকেই কুড়াবেন। এখান থেকে এর বেশী নয়। আর বাকী ৩ দিনের প্রত্যেক দিনের ২১টি করে কংকর মিনা থেকেই কুড়ানো যায়। এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে হারামের মধ্যবর্তী যে কোন স্থান থেকেই কংকর কুড়ানো জায়েয আছে।

মুযদালিফায় সুবহে সাদিকে ঘুম থেকে উঠে একটু আগেভাগে আউয়াল ওয়াক্তেই ফজরের সালাত আদায় করে নিবেন। ফজরের সময় দুই রাকাত সুন্নাত ও দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করবেন। এবার মুযদালিফায় উকুফ করবেন, দো'আ-যিকর করবেন ঠিক যেমন আল্লাহ করতে বলেছেন সূরা আল-বাকারা: ২:১৯৮ এবং সূরা-আল আ'রাফ, ৭:২০৫ আয়াতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় 'কুযাহ' পাহাড়ের পাদদেশে উকুফ করেছেন। এ স্থানটি বর্তমানে আল মাশার-আল হারাম মসজিদের সন্মুখভাগে অবস্থিত। এ মসজিদটি মুযদালিফার ৫নং রোডের পাশে অবস্থিত এবং ১২ হাজার মুসল্লী ধারন ক্ষমতা রাখে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি এখানে উকুফ (অবস্থান) করলাম তবে মুযদালিফার পুরোটাই উকুফের স্থান"। সহীহ মুসলিম (২/৮৯৩)

এখানে রাতের বেলায় খাবার ও পানি কেনার জন্য দোকান পাবেন না। এ কারণে কিছু খাবার ও পানীয় মজুদ রাখলে ভালো হয়। ফজরের সালাত আদায় করার জন্য প্রয়োজনে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবেন।

১০ই যিলহজ্জ অর্থাৎ ঈদের দিনের কাজঃ

মীনায় তাবুতে পৌছে নাস্তা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আপনি ছোট ব্যাগটির কিছু জিনিষ রেখে(যেমন বিছানা,কাপড়) হালকা করে পরবর্তী কাজের জন্য বের হবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ই যিলহজ্জ দিনটিকে হজের বড় দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১০ই যিলহজ্জ অর্থাৎ ঈদের দিনের নিম্নবর্ণিত ৪টি কাজ :

(১) কংকর নিক্ষেপ শুধুমাত্র বড় জামারায়(রমি করা),

(২) কুরবানী করা,

(৩) চুল কাটা

(৪) তাওয়াফ করা অর্থাৎ তাওয়াফুল ইফাদা বা ফরয তাওয়াফ ও সা'ঈ করা।।

এ দিনে না পারলে পরবর্তী ২ দিনের মধ্যে বা অন্য যে কোন সময় করলেও চলবে।

জামারাত এলাকা মিনার সীমানার মধ্যে পড়ে। কংকর নিক্ষেপ বা রামি করা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা মারওয়া সা'ঈ ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ আল্লাহর যিকির কায়েমের উদ্দেশ্যে।(তিরমিযী'' হাদীসে আরও এসেছে ''আর তোমার কংকর নিক্ষেপ, সে তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয়''। আবু দাউদ-১৬১২; সহীহ মুসলিমঃ ১৩৪৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উঠার ১-২ ঘন্টার মধ্যে কংকর মেরেছিলেন। সে হিসাবে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। অবশ্য সূর্য উঠা থেকে শুরু করে ১১ যিলহজ সুবহে সাদিক পর্যন্ত কংকর মারা জায়েয।মীনার তাবু থেকে বের হয়ে জামারায় পাথর মারার জন্য নিচতলায় না যেয়ে, আগেই সেই রাস্তা দিয়ে চলুন (প্রয়োজনে সঠিকভাবে জেনে নিন) যেটা চলে গিয়েছে জামরার উপরের ফ্লোরগুলোতে।

কংকর নিক্ষেপের শর্তঃ

(১) জামারার খুঁটিকে লক্ষ্য করে কংকর ছুঁড়ে মারতে হবে। অন্যদিকে টার্গেট করে মারলে খুঁটিতে লাগলেও শুদ্ধ হবে না।

(২) ঢিলটি জোরে নিক্ষেপ করতে হবে। সাধারণভাবে কংকরটি সেখানে শুধু ছুয়ায়ে দিলে হবে না।

(৩) কংকরটি পাথর হতে হবে। মাটি বা ইটের টুকরা দিয়ে হবে না।

(৪) কংকরটি হাত দিয়ে নিক্ষেপ করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের খেলনা, গুলাল, তীর বা পা দিয়ে লাথি মেরে নিক্ষেপ করলে হবে না।

(৫) সাতটি পাথর হাতের মুঠোয় ভরে একেবারে নয় বরং একটি একটি কংকর হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করতে হবে।

কংকর নিক্ষেপের সুন্নাতঃ

(১) মিনায় প্রবেশ করে কংকর নিক্ষেপের আগে অন্য কিছু না করা।

(২) কংকর নিক্ষেপ শুরু করার পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দেয়া।

(৩) প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" বলা। ডান হাতে নিক্ষেপ করা। পুরুষের হাত উঁচু করে নিক্ষেপ করা। মেয়েরা হাত উঁচু করবে না।

(৪) কংকরের সাইজ হবে গুলালের গুলির কাছাকাছি বা চানা বুটের দানার চেয়ে একটু বড়।

(৫) প্রথমদিন সূর্যোদয়ের পরে মারা সুন্নাত।

(৬) দাঁড়ানোর সুন্নত হলো মক্কাকে বামপাশে এবং মিনাকে ডানে রেখে 'জামারার' দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। এরপর নিক্ষেপ করবে। প্রচণ্ড ভীড় হলে যে কোন দিকে দাঁড়িয়েও মারতে পারেন।

(৭) একটা কংকর মারার পর আরেকটি মারা। অর্থাৎ দুই কংকরের মধ্যে বেশী সময় না নেয়া।

(৮) কংকরগুলো পবিত্র হওয়া মুস্তাহাব। অপবিত্র হলেও তা দিয়ে নিক্ষেপ করা যাবে। তবে মাকরূহ হবে।

যেহেতু মিনার খাইফ মসজিদের দিক থেকে জামরাতে ঢুকেছেন সেহেতু পথে আপনি প্রথমে ছোট জামরাহ (জামরাতুল সুগরা) ও তারপর মধ্যম জামরাহ (জামরাতুল উস্তা) অতিক্রম করবেন এবং অতঃপর সবশেষে পৌঁছাবেন বড় জামরাহর (জামরাতুল 'আকাবাহর) কাছে।
বড় জামরার কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দেবেন। তালবিয়াহ পাঠ এখানেই শেষ। বড় জামরাহে কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।

জামরার হাউজ বা বেসিনে বুক লাগিয়ে অথবা ২-৩ মিটার দূরত্ব থেকে জামরায় রমি করুন। কংকরগুলো যেন জামরার দেওয়ালে আঘাত করে অথবা জামরার বেসিনের মধ্যে পড়ে সেটা নিশ্চিত করুন। যদি কোনো কংকর বেসিনের মধ্যে না পড়ে তবে তার পরিবর্তে আবার একটি কংকর নিক্ষেপ করুন। সে কারণে সঙ্গে অতিরিক্ত কংকর নিয়ে নেবেন। কংকর যদি জামরার দেওয়ালে লেগে বা বেসিনের মধ্য থেকে ছিটকে বাইরে পরে যায় তাতে সমস্যা নেই। কংকর আংগুল দিয়ে যে কোনভাবে ধরে নিক্ষেপ করা যাবে। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। নিজের কংকর নিক্ষেপ হয়ে গেলে ঠিক একই নিয়মে অন্যের কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন। খুশু-খুজুর সাথে কংকর নিক্ষেপ করুন।

রমি করা শেষে এখানে দাঁড়িয়ে দো'আ করার কোনো নিয়ম হাদীসে পাওয়া যায় না। জামরাহ থেকে বের হয়ে এস্কেলেটর বা লিফট দিয়ে মক্কার দিকে নেমে পড়ুন। এবার হাদী বা পশু জবাই এর জন্য মু'আইসম বা অন্য কোনো স্থান যেখানে আপনি আগে থেকেই নির্ধারণ করেছেন সেখানে চলে যাবেন।
আর যদি ব্যাংকে টাকা দিয়ে থাকেন, তাহলে আর আপনার কোনো করণীয় নেই। আপনি মাথা মুণ্ডিয়ে কিংবা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবেন। চুল কাটার পর এই অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য সব কিছুই হালাল হয়ে যাবে যা ইহরাম অবস্থায় হারাম ছিল। এটাকে প্রথম হালাল বা তাহাললুলে আওয়াল বলা হয়।

কংকর নিক্ষেপ শেষে তাকবীরে তাশরিক পড়া শুরু করুন এবং ১৩ যিলহজ আসরের সালাত পর্যন্ত চলবে এ তাকবীর। প্রতি ফরয সালাতের পর উচ্চস্বরে এ তাকবীর পড়ুন।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ"।
"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

যে ধরনের উযর থাকলে মিনায় রাত্রি যাপন না করলেও গোনাহ হবে না?
(১) সম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে।
(২) নিজের জানের নিরাপত্তার অভাববোধ করলে।
(৩) এমন অসুস্থতা যে অবস্থায় মিনায় রাত্রি যাপন করলে তার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে।
(৪) অথবা এমন রোগী সাথে থাকা যার সেবা-শুশ্রুষার জন্য মিনার বাইরে থাকা প্রয়োজন।
(৫) এমন লোকের অধীনে চাকুরীরত যার নির্দেশ অমান্যে চাকুরী হারানোর ভয় আছে, এ ধরনের শরয়ী ওযর থাকলে।
১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ তারিখে দিনের বেলায় মিনায় থাকা জরুরী না, তবে থাকাটা উত্তম।

তাওয়াফে ইফাদা

এই অবস্থায় সুগন্ধি মাখা ও তাওয়াফে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) বা তাওয়াফে যিয়ারাত করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নাত। এটা হজ্জের আরকান সমূহের মধ্যে অন্যতম। এটা ভিন্ন হজ্জ উদযাপন পূর্ণ হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন:

অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করা এবং তাদের মানৎ পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের-কাবা ঘরের।সূরা আল হাজ্জ:২৯

এ তাওয়াফটি হজ্জের একটা রুক্ন অর্থাৎ ফরজ। এটা ছুটে গেলে হজ্জ হবে না। তাওয়াফে ইফাদার অপর নাম তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ফরয তাওয়াফ।

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকয়াত নামায পড়ে সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে সাঈ করবে তাহলে হজ্জে তামাত্তু পূর্ণ হলো।এ সাঈর পর আর চুল কাটতে হবে না।

মাসিক স্রাব-গ্রস্ত মহিলাগণ এ তাওয়াফ করার জন্য অপেক্ষা করবেন। স্রাব বন্ধ হলে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নিবেন। এক্ষেত্রে কোনো দম দিতে হবে না। আর যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে স্রাব বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত কোনো ক্রমেই অপেক্ষা করা যাচ্ছে না ও পরবর্তীতে এসে তাওয়াফ যিয়ারাহ আদায় করে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, তবে জমহুর ফুকহা ও আরো আলেম-আলেমগণের মত অনুযায়ী ন্যাপকিন দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে তাওয়াফ সেরে নেওয়া যাবে।

১০ জিলহজ তাওয়াফ ও সা'ঈ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সন্ধ্যা বা মধ্য রাতের পূর্বেই তাশরীকের রাত্রিযাপনের জন্য মিনায় ফিরে আসুন।

যে সমস্ত কাজ পূর্ণ করার ফলে হাজীগন পুরোপুরি হালাল হয়ে যায় তা তিনটি----------

* বড় জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ
* মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করা
* তাওয়াফে ইফাযার সাথে সাঈ করা

হাজ্জ পালনকারীদের জন্য এই তিনটি কাজ সমাধা হয়ে গেলে তার জন্য ইহরামের কারনে নিষিদ্ধ প্রত্যেকটি কাজ হালাল হয়ে যাবে, স্ত্রীর সাথে মিলন, সুগন্ধি লাগানো ইত্যাদি।

এবার হাজীগন আবার মীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এই তারিখে অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জে।

১০ ও ১১ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতগুলোতে মিনায় থাকা ওয়াজিব।

১২ই যিলহজ্জ তারিখে পাথর নিক্ষেপ শেষে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে না পারলে ঐ তারিখের দিবাগত রাতেও মিনায় থাকা ওয়াজিব হয়ে যায়।

হজের কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে করা সুন্নাত: কংকর নিক্ষেপ, হাদী, কসর/হলক্ব, তাওয়াফে ইফাদাহ, সা'ঈ করা; কিন্তু কেউ যদি ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে কোনটি আগে বা কোনটি পরে করেন কোনো জটিলতার কারণে তাহলে তা করা যাবে। কারণ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীসে লোকদের বিভিন্ন কাজ আগে পরে হওয়ার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''কর, কোনো অসুবিধা নেই'', ''কোনো সমস্যা নেই''।

সহীহ হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬২৫, ১৬২৬; ইফা; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৫; মুসনাদে আহমদ; ইবন মাজাহ।

যে ধরনের হাজীদের পক্ষে বদলী পাথর নিক্ষেপ জায়েয তারা হলেন দুর্বল, রোগী, অতি বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য।

যে শর্তে বদলী কংকর নিক্ষেপ জায়েয সেই ক্ষেত্র হলো--

(১) যিনি বদলী মারবেন তিনি একই বছরের হাজী হতে হবে।

(২) যার পরিবর্তে বদলী মারবেন তিনি অবশ্যই অক্ষম ব্যক্তি হতে হবে।

(৩) প্রথমে হাজী নিজের পাথর মারবেন, এরপর অক্ষম ব্যক্তির কংকর মারবেন।

আইয়ামে তাশরীকের ১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ

মিনায় অবস্থান করে সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত, তসবিহ তাহলিল, দো'আ, যিকির ও ইসতেগফার করা বাঞ্ছণীয়। তাই তাবুর মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অথবা গল্পগুজব ও ঘুরাঘুরি না করে মিনার সময়গুলোকে কাজে লাগানো উত্তম। মিনায় সালাত আদায়ের নিয়ম ৮ই যিলহজের মতো করে হবে। মিনায় এ তাশরীকের রাতগুলো যাপন করা ওয়াজিব। মিনায় দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি জামরাহে গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করুন, এটি কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময়। এতে মোট ২১টি কংকর লাগবে (প্রতিটির জন্য ৭টি করে)। অবশ্য দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা যেতে পারে। কংকর নিক্ষেপের সময় জামরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়। মুসনাদে আহমদ, সহীহ মুসলিম

মীনায় তিনদিন তিনরাত অবস্থান করে প্রতিদিনই সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতেই কঙ্কর মারবে। এইক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে কঙ্কর মারার তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব।

জামরা উলা (প্রথম)-মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে। প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে। একের পর এক ৭টি নিক্ষেপ করবে, এরপর কিছুটা পিছিয়ে এসে জামরাকে বামে রেখে কিবলামুখী হয়ে দুহাত তুলে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

২য় জামরা—প্রথমবারের মতই নিক্ষেপ করবে, তবে নিক্ষেপের পর কিছুটা সম্মুখের দিকে সরে যাবে এবং জামরাকে ডানে রেখে কিবলাকে সম্মুখে রেখে হাত উঠিয়ে দোয়া করবে।

৩য় জামরা- এখানে কঙ্কর নিক্ষেপের পর সেখানে আর দাঁড়াবে না এবং দোয়াও পাঠ করবে না। কঙ্কর মেরেই চলে আসবে। যদি এক বা একাধিক কংকর কম নিক্ষেপ করে থাকে তবে তার প্রতিটি কংকরের জন্য অর্ধেক সা'আ (অর্থাৎ এক কেজি বিশ গ্রাম) পরিমাণ গম, খেজুর বা ভুট্টা দান করতে হবে। আর ঘাটতি কংকরের সংখ্যা ৩ এর অধিক হলে দম দিতে হবে।

১৩ই যিলহজ্জ দিন আসরের সালাতের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক পড়া শেষ।

মক্কা থেকে বিদায়

মক্কা মুয়াযযমায় অবস্থানকালে হাজীগন সর্বক্ষন আল্লাহর যিকর,আনুগত্য,আমলে সালেহ, দুয়া-দরুদ,নফল নামায ও তাওয়াফ করবেন। যখন এখান থেকে চলে যেতে চান দেশে তখন তাদের জন্য তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব, যেন তাদের সর্বশেষ অবস্থান কালটি বাইতুল্লাহতে ব্যয়িত হয়।
ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। লোকদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের শেষ সময়টি যেন সমাপিত হয় বাইতুল্লাহে। কিন্তু ঋতুবতী নারীদেরকে এ বিষয়ে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সহিহ বুখারী ও মুসলিম
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই আল্লাহর অশেষ কৃপা ও দয়ায় হাজীগণ পরিপূর্ণভাবে হজের সকল কাজ আদায় করার পর এই তো এক্ষণে হাজীদের কাফেলাসমূহ পবিত্র ভূমি থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের এ বরকতময় সফরের সমাপ্তি ঘটবে বিদায়ী তাওয়ফের মাধ্যমে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য যারা মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে চান, এ তাওয়াফই হল তাদের জন্য হজের সর্বশেষ ওয়াজিব কাজ। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :
“বায়তুল্লার তাওয়াফ প্রত্যেক ব্যক্তির শেষ কাজ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মক্কা থেকে বেরিয়ে না যায়।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৮৩।

ঠিক উমরার তাওয়াফের যে নিয়ম, বিদায়ী তাওয়াফের নিয়মও তেমনি। অবশ্য এ তাওয়াফ হাজী তার স্বাভাবিক পোষাক পরেই করবে এবং এতে রমল ও ইযতিবা’ করা সুন্নাত নয়। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু’রাকাত নামায পড়ুন। এরপর মাসজিদুল হারাম থেকে বেরিয়ে পড়ুন এবং মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দো‘আটি পাঠ করুন :
«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ الله، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»
“আল্লাহর নামে (বেরিয়ে যাচ্ছি)। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।”সহিহ মুসলিম

এরপর আপনি নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধান আপনাকে ঘিরে রাখবে। বিদায়ী তাওয়াফের পর যদি আপনি থাকাবস্থায়ই ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় কিংবা আপনি নফল নামায পড়তে চান, তাহলে তাতে অসুবিধা নেই। তবে আপনি দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে পারবেন না। চেষ্টা করুন যেন বিদায়ী তাওয়াফটাই মক্কায় যেন আপনার শেষ অবস্থান হয়।

আজকাল অনেকে নিয়ম মোতাবেক হজের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করার পরও কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে, কে জানে কোথাও কোনো ভুল হলো কি না! কিছু হজ এজেন্সির নেতাদেরও দেখা যায় তারা হাজী সাহেবদের উৎসাহিত করেন যে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তাই একটা দমে-খাতা দিয়ে দিন, শতভাগ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার হজ!
এরূপ করাটা মারাত্মক অন্যায়। কেননা আপনি হজ সহীহ শুদ্ধ ভাবে পালন করা সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় হজকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি কোনো বিষয় নিয়ে সত্যি সন্দেহ হয় তবে একজন বিজ্ঞ আলেমকে আপনার হজের সমস্যার কথা বলে শুনান। তিনি যদি দম দিতে বলেন তবেই দম দিন। অন্যথায় নয়। শুধু আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে দমে-খাতা দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে নেই। তবে হাঁ, আপনি চাইলে নফল পশু জবাই সাদকা হিসাবে করতে পারেন। আর দম দিতে চাইলে কাউকে বিশ্বাস করে হাতে রিয়াল দিয়ে ছেড়ে দিবেন না। ব্যাংক এর বুথে গিয়ে দম টিকিট কিনে দিন অথবা হালাকা (পশুর হাট এলাকা) গিয়ে নিজে দম দিয়ে আসুন।

মসজিদে নববী দর্শন

মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী যিয়ারত করা মুস্তাহাব আমল। পবিত্র মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে মদীনা মুনাওয়ারা রওনা দেবেন। সেখানে পৌঁছে সালাত আদায়ের পর আপনি নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করবেন। কিন্তু আপনার সফরটি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হবে না। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে লম্বা ও কষ্টসাধ্য সফর করা শরীয়তে জায়েয নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

অর্থাৎ, (ইবাদতের নিয়তে) মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা ব্যতীত কঠিন ও কষ্টসাধ্য সফরে যেও না। (বুখারী ১১৮৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলার একদল ফিরিশতা রয়েছে যারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। যখনই আমার কোনো উম্মত আমার প্রতি সালাম জানায় ঐ ফিরিশতারা তা আমার কাছে তখন পৌঁছিয়ে দেয়’’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, ‘‘যে কেউই আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ তা‘আলা আমার রুহকে ফেরত দেন, অতঃপর আমি তার সালামের জবাব দেই’’।নাসাঈ ১২৮২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ ।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

‘‘আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ’’

‘‘হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক’’।

পাশাপাশি চাইলে সালাতের তাশাহুদের পর যে দুরূদ ইবরাহীম পাঠ করেন তা এখানেও এখন পাঠ করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার উত্তম পন্থা হলো দুরূদ ইবরাহীম পাঠ করা।

রাসূল স. বলেছেন, ইব্রাহীম আ. মক্কাকে হারাম ঘোষনা করেছিলেন, আর আমি এই মদিনাকে তথা এই প্রস্তরময় দুভূমির মাঝখানের অংশকে হারাম বলে ঘোষনা করছি, এর বৃক্ষসমূহ কাটা যাবে না এবং এর প্রানী শিকার করা যাবে না। সহিহ মুসলিম:৩৩৮৩

মদিনার পথে প্রান্তরে রয়েছে (প্রহরী) ফিরিশতাগন, (তাই) এখানে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।সহিহ বুখারী:১৮৮০

ঈমান মদিনার দিকে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে। সহিহ বুখারী: ১৮৭৬

যে ব্যক্তি আমার মসজিদে শুধু এই জন্যে আসে যে, সে কোন কল্যানের দীক্ষা নিবে কিংবা অন্যদের শিক্ষা দিবে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতূল্য। হাকিম:৩০৯

বুখারি ও মুসলিম শরীফের শর্তানুযায়ী

যে ব্যক্তি মদিনায় কোন পাপ করে, অথবা পাপাচারী আশ্রয় দান করে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগন ও সকল মানুষের লা’নত পড়বে। কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে আল্লাহ কোন ইবাদাত ও দান গ্রহন করবেন না। সহিহ বুখারি:১৮৭০

রাসূল স.বলেছেন, আমার এ মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মাসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

রাসূল স.বলেছেন, আমার এ মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মাসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। আর মাসজিদে হারামে এক ওয়াক্ত নামায আমার এ মাসজিদে একশত নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

মাসজিদে কুবা—মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতে পর মুসলমানদের প্রথম মসজিদ এটি। কুবা নামক স্থানে রাসূল স. সাহাবাদের নিয়ে কিছুদিন অবস্থান করে এই মসজিদ নিজ হাতে নির্মান করেন। পরবর্তীতে মসজিদে নববী নির্মান হলেও সপ্তাহে একদিন রাসূল স.এই মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন।

রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ওযূ করে কুবা মসজিদে উপস্থিত হল, তারপর সেখানে নামায পড়ল, তার জন্য এক উমরার নেকীর সমান পূণ্য অর্জন হল।ইবনে মাজা,নাসায়ী

হজের সময় যেসব জিনিসপত্র সঙ্গে নিবেন (সংগৃহিতঃ হজ সফরে সহজ গাইড মুহাম্মাদ মোশফিকুর রহমান)

প্রথমে ঠিক করে নিন আপনি কোন প্রকারের হজ করবেন এবং জেনে নিন আপনার প্রথম গন্তব্যস্থল কোথায়। (প্রথমে মক্কা না মদীনায় যাবেন)
আপনার গন্তব্যানুসারে যাত্রার প্রস্তুতি নিন। (ধরে নিচ্ছি আপনি প্রথমে মক্কায় যাবেন)
বেশি মালামাল নিয়ে আপনার বোঝা ভারী করবেন না, আবার কম নিয়ে অপ্রস্তুতও হবেন না।
পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি নোটারি করে নিন এবং বিমানের টিকেট ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের ফটোকপি করে নিন। বাসায়ও এর কপি রেখে যান।
অতিরিক্ত ১০ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও ১০ কপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙ্গিন ছবি সঙ্গে নিন।
মজবুত চাকাওয়ালা মাঝারি বা বড় আকারের ১টি ব্যাগ/লাগেজ সঙ্গে নিবেন।
মুল্যবান জিনিসপত্র (টাকা, টিকেট, পাসপোর্ট ইত্যাদি) রাখার জন্য ১টি কোমর/কাঁধ/সৈনিক ব্যাগ নিন।
সালাতের মুসাল্লা বা কাপড়, কাপড় শুকানো দড়ি ও ব্যাগ বাঁধার জন্য কিছু ছোট দড়ি সঙ্গে রাখুন।
পড়ার জন্য ছোট আকারের কুরআন মাজীদ ও বইপত্র এবং লোকেশন ম্যাপ সঙ্গে রাখুন।
যোগাযোগ এর জন্য সাধারণ মোবাইল অথবা এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।
দুই জোড়া করে চশমা ও কোমল স্লিপার সেন্ডেল এবং এগুলো রাখার জন্য ছোট পাতলা কাপড়ের একটি ব্যাগ।
রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছোট সাদা বা বিশেষ রঙের ছাতা অথবা ক্যাপ।
পশু যবেহ (হাদী) বা ফিদিয়ার জন্য ৫০০-৬০০ সৌদি রিয়াল আলাদা করে রাখতে ভুলবেন না।
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র: ব্রাশ, পেস্ট, টয়লেট পেপার, আয়না, চিরুনি, তেল, সাবান, তোয়ালে, শ্যাম্পু, নোটবুক, পারফিউম, ভ্যাসলিন, লোশন ও ডিটারজেন্ট ইত্যাদি সাথে নিন। তবে ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য সেসব প্রসাধনী সুগন্ধহীন হতে হবে।
দুইটি ছোট বেডশিট ও একটি ফোলানো বালিশ, হালকা চাদর, পেষ্ট, গ্লাস, চামচ, টর্চ লাইট, বাথরুম সুগন্ধি, মুখোশ, রুমাল ও কাপড় হ্যাঙার প্রয়োজন মনে করলে সাথে নিন।
একটি দেশের পতাকা, এলার্ম ঘড়ি/হাত ঘড়ি, রোদ চশমা, মার্কার পেন।
পর্যাপ্ত ওষুধপত্র, কিছু দরকারি এন্টিবায়োটিক, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ভ্রমণের জন্য দরকারি কিছু ওষুধ।
ব্যাগের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে ছোট আকারের তালা-চাবি নিন এবং কিছু পলিথিন ব্যাগও নিন।
দরকারি জিনিসপত্র (টাকা, টিকেট, পাসপোর্ট, হজের পরিচয়পত্র, ক্রেডিট কার্ড) সবসময় হাতের কাছে অথবা নিরাপদ স্থানে রাখবেন।
সঙ্গে কিছু বাংলাদেশী টাকাও রাখবেন।
একটি সাধারণ পরামর্শ হলো : আপনার নাম, পাসপোর্ট নম্বর, হজ পরিচয়পত্র নম্বর, যোগাযোগের মোবাইল অথবা ফোন নম্বর, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ও নং, হোটেলের নাম ও ঠিকানা, যে কোনো নিকট আত্মীয়ের নাম ও ঠিকানা ও মুয়াল্লিম নং আপনার সকল ব্যাগে ইংরেজিতে লিখে রাখবেন।
কিছু শুকনো খাবার যেমন-চিড়া, গুড়, বিস্কুট, বাদাম, ড্রাই কেক, ইত্যাদি সঙ্গে রাখুন।
হজে যাওয়ার সময় আপনার মালামালের একটি তালিকা করুন ও তালিকা চেক করুন।
হজে যাওয়ার সময় আপনার বড় লাগেজের আদর্শ ওজন হবে ৮ থেকে ১০ কেজি।
শেষ কথা হলো; হজে যাওয়ার সময় অবশ্যই সূরা-আল বাকারা-এর ১৯৭ নং আয়াতকে সাথে ব্যাগে নিয়ে নয় বরং অন্তরে করে নিয়ে যাবেন!

[পুরুষদের জন্য]
ইহরামের জন্য দুই সেট সাদা কাপড়।
ইহরামের কাপড় বাধার জন্য কোমর বেল্ট।
মাথা মুড়ানোর জন্য ১/২টি রেজার অথবা ব্লেড। তবে তা কোনোক্রমেই হাতের ব্যাগে রাখবেন না।
উপযুক্ত ও আরামদায়ক: প্যান্ট, শার্ট, ট্রাউজার, লুঙ্গি, টি-শার্ট, আন্ডারওয়্যার, পাঞ্জাবি, স্যান্ডেল, মোজা, জুতা, টুপি ইত্যাদি।

[মহিলাদের জন্য]

পরিষ্কার ও আরামদায়ক সালওয়ার-কামিজ, স্কার্ফ, হিজাব।
পুরো যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত কাপড়।
লেডিস ন্যাপকিন, সেফটি পিন, কেঁচি, টিস্যু, স্যান্ডেল, মোজা ও জুতা ইত্যাদি।

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيْرًا

মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে রাসূলের স. উম্মত হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

হে আমাদের রব! আমাদের জন্য তুমি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। তুমি তো সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান

সূরা আত-তাহরীম: ৬৬:৮